মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর, ২০২৪
ভাদ্র, ১৪৩১

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৪৩১/সেপ্টেম্বর ২০২৪

কালের স্রোতে ভেসে উঠবে দিব্য চেতন		৩
ব্রহ্ম অভীপ্সার পরিপূর্ণতায় ব্রাহ্মোপলব্ধি	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
সিঁড়ি	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৪
ভগবানে ভক্তি	ভক্তিপ্রসাদ	১৫
সৎ কর্মের অভ্যাস প্রয়োজন	সায়ক ঘোষাল	১৫
ভগবানকেই চাই	তানিয়া ঘোষাল	১৬
শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে	আশুরঞ্জন দেবনাথ	১৭
ব্রহ্মনির্বাণ ও জন্মান্তরবাদ	শ্রীমৎ অনির্বাণ	২২
অভিমান খুব খারাপ জিনিস, মা	মনোজ বাগ	২৪

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

কালের স্রোতে ভেসে উঠবে দিব্য চেতন

এখনই এসেছে জীবন মাঝে তোমারই স্পন্দন জাগরণপর্বে। / দাও তোমার অনুভবের প্রসাদ জীবন মাঝে নিত্য আবেশে
যে বার্তা এসেছে জীবনের এই নিত্য প্রকাশের পথে পর্বে পর্বে / এখন সেই বার্তাই জীবন মাঝে আসুক হয়ে জীবন পথের সাথী।
দাও তোমারই অনুভবের বার্তার নিত্য বিকাশ এই জীবন পর্বে / এখন হোক তোমারই মন্ত্রের ধ্বনি উদ্গাত এই জীবনের বিকাশে।।

ভুবন বিস্তৃত দেব প্রসাদে ঃ আপৌ বৈ অস্মৈ পিত্রেব পুত্রা। / উগ্র এব রুচা নৃপতীব তুর্যে।
ইয়েব পুষ্টৌ কিরণেব ভূজৈ। / শ্রুষ্টীবানবে হবমা গমিষ্টম্।। (ঋ. বে. ১০/১০৬/৪)

যা কিছু ছিল জীবন মাঝে প্রেরণার বীজ সর্বদা / হয়েছে যত দিব্য বিকাশের সূত্র জীবনের মাঝে
যেমন করেই হয়েছে সব উদ্যোগের অভিমুখ এগিয়ে চলায় / তেমনে এসেছে দিব্য প্রভা ভগবৎ ভাব উন্মোচনের পর্ব।
হয়েছে সাধন জীবন বৃত নিত্য অন্বয়ে তোমারই ভাবপথে / এখন সে ভাব পথ হয়েছে উন্মুক্ত তোমার এই বিচার পর্বে।
ভুবন মাঝে বিস্তৃত তোমারই বিকাশ এসেছ তোমার প্রসাদে। / প্রেরণার বিকাশ হয় নিত্য উদ্যোগের এই পথ মাঝে।।

ব্রহ্মসত্য জগৎ সত্য ঃ

বংসগেব পূর্যয়া শিম্বাতা। মিত্রেব ঋত শতরা শাতপন্তা। / বাজেব উচ্চ বয়সা ধ্রর্মেষ্ঠা। মেযেব ইষা সর্বষা পুরীষা।।
তুমিই সত্য তুমিই হয়েছো জীবনে ভাস্বর / এখন হোক তোমারই বিজয় প্রভা জীবনের এই জাগরণে।
এই ধরিত্রীর বুকে অন্তরীক্ষে আকাশের পটে হয়েছে মূর্ত / দাও তোমারই করুণার ধারা জীবন মাঝে স্বতঃই অবাধে।
জীবনের ব্রতপথে এখন তোমারই প্রকাশ পর্ব জীবন মাঝে / তোমারই নিত্য প্রভায় হোক জগৎ ভরপুর সদা আনন্দে।
তোমার অনুভবের প্রাচুর্য হোক জীবনের সঞ্চয় সর্বত্র। / এখন নিত্য বিকাশ পর্বের হোক পূর্ণ প্রভাময় বিস্তার জগতে।।

সৃষ্টির আদি পর্ব থেকেই কালস্রোতের গতিমুখ রয়েছে সামনের দিকে। জীবন এগিয়ে চলেছে সম্মুখে। পার্থিব বিজ্ঞানের সূত্র হল বিগত দিনের মানুষের জীবন নির্বাহের যে স্বচ্ছন্দ্য ও সুখবোধ ছিল সেটি অনিশ্চিয়তার মোড়কে ভরা প্রকৃতির পথচলার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানের অবস্থানটি অন্য। বর্তমানে মানবের যে সুখবোধ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ সেটি আধুনিক প্রযুক্তির বিকশিত অবস্থার উপর নির্ভর করে রয়েছে। জীবনযাপনের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটির মৌল অবস্থা হল প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের উপর আস্থা স্থাপন করে সে পথেই এগিয়ে যাওয়া। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি হল দৈহিক শ্রম আর দৈহিক নির্ভরতা যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়ে মেধা-চিন্তা ও মস্তিষ্কের প্রয়োগের দীপ্তি বাড়িয়ে তোলা। জড় নির্ভরতা বহিরঙ্গ অবস্থান থেকে সরে ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গ অবস্থায় পৌঁছে যায় স্বভাবতই। এই জড় পরিচয়ের মধ্যেই যে পরম চৈতন্য অবস্থান করছেন আধুনিক জীবন সেই জড় পরিচয়কে করে অতিক্রম চৈতন্য শক্তি উদ্বোধন করতে যদি এগিয়ে না আসে তবে অনন্ত বাসনার ঘূর্ণাবর্ত তার জীবনকে ঐ জড় আবর্তনেই বন্ধ করে রাখে আর ক্রম নির্ভরতাকে বাড়িয়ে দেয়। ঋষিদের ধ্যান অনুভবে যে সত্য ফুটে উঠেছিল, সেটি বিপরীত মাত্রার হয়েছে। ঋষি পূর্ণ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে ওই পূর্ণ সত্যের জগৎ প্রকাশে ব্যাপ্ত করেছেন। ঋষির উপলব্ধিতেঃ 'যতঃ বাচঃ নির্বচন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণং বিদ্বান। ন বিভেতি কদাচন।' (তৈত্তিরীয় উপ. ২/৪/১)

মনের প্রভা সৃষ্টিকারী মনোময় কোষ যদি বাইরের প্রভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রকৃত সত্যের স্বরূপ বোধ অজ্ঞাত হয় না যখন, জীবন ওই ব্রহ্মানন্দের স্পর্শ থেকে স্বাতন্ত্রে বিরাজ করেও জীবচেতনের প্রাকৃত অবস্থা ও অবস্থানের পরিচয় দিতে সক্ষম হয় না। কালের স্রোতে জড় চেতন ভেসে যায়।

Past present and future are the constituents of time. The past is history, present is now; the future is yet to come. 'Now is offen called the moving present it connects past and future and sweeps through our lives and the Universe. But what is this now? It is an infinitely thin slice of time the samllest imaginable unit. Does time consist of an infinite procession of these nows?

Aristotle thought not. At any given moment Now, the previous Now, must have disappeared in its own life time for then it was Now; but it can not have disappeared in a subsequent Now, since the Nows must be sequential and cannot coexist. Therefore, it seems that there are no successions of now. Furthermore, some segments of time have already passed and others are to come, but none of them is now, for now can not be a segment, it is only a division between past and future. It flows, some say, that time itself does not exist, since neither past nor present exist, and if there is no Now, then there is no time.

(Adam Hart-Davis, The Book of Time, The Secrets of Time, How it works and How We Measure It, Mitchell Beazley, 2011, p. 12-13)

জগতের তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যজনিত সুখবোধ জীবের জীবনপথের ভাগবতী প্রজ্ঞা অর্জনের পথে হয়ে যায় অন্তরায়। সময়ের এগিয়ে চলার পথটিও এমন বয়ে যায়; পিছনে ফেলে রাখে ঘটনাগুলো আর তাদে সম্মুখের শক্তিকে বাড়িয়ে দেয় না। ভগবানে নিবেদিত মন একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান জীবনের উদ্দেশ্যে হিসাবে গ্রহণ করে এই মনের মাঝে ভাগবতী বাকস্বরূপে ধারণ করে নিতে পারে ভাগবতী চেতন। মহাকালের কাল প্রবাহে যুক্ত হয়ে জীবচেতন তখন ভাগবতী ভাবচেতনময় হয়ে ওঠবার সামর্থ পেয়ে যায় আর সেইরূপ প্রাণের মাঝে মনোময় আর মনের মাঝে বিজ্ঞানময় পরম চেতনকে অঙ্গীকার করে নিতে পারে। এমন করেই ব্রহ্মচেতন হবে জাগ্রত জগৎ মাঝে।

—ঃঃ—

ব্রহ্ম অভীপ্সার পরিপূর্ণতায় ব্রাহ্মোপলব্ধি

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মই পূর্ণ সত্য। ব্রহ্ম সত্যে নিহিত রয়েছে জগতের সত্য। যা কিছু বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত সত্য অথবা যা কিছু রয়েছে অজ্ঞাত, অধরা এ সবই ব্রহ্ম সত্যের অভ্যন্তরে নিহিত। অন্তর রাজ্যের যা কিছু সত্য জানা হয়েছে অথবা রয়েছে যা কিছু অধরা এসবই ব্রহ্ম সত্যের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পরিচয় মাত্র। যে জল মাপা হয়েছে, আর যে অসীম জলাশ্রয় সমুদ্রের পরিমাপ সীমার অতীত এক বিশাল জলের উৎস এ সবই ব্রহ্ম সত্য। অনন্ত ব্যাপ্ত এই আকাশ মহাকাশের মাত্র কিছু অংশ বিজ্ঞানের পরিভাষায় জানা হয়েছে; আর যে অনন্ত অসীম মহাকাশ মহাশূন্যে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে সে সত্য। এ সবই ব্রহ্ম সত্যে অম্বীত; ব্রহ্ম সত্যের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রকৃতি পঞ্চক ভূমি-জল অনল-বায়ু-আকাশ-সমগ্রতায় ব্রহ্ম সত্যেরই এক খণ্ড পরিচয় মাত্র। জ্ঞান ইন্দ্রিয়-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় — হস্তপাদ-উপস্থ-পায়ু-মুখ; চারটি চেতন ইন্দ্রিয় — মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-চিত্ত; চতুর্দশ ইন্দ্রিয় মানব জীবন অস্তিত্বে বিরাজমান—এসবই ব্রহ্মসত্যের এক একটি অংশ প্রকাশ। সপ্ত ধাতু-অস্থি-মজ্জা-ত্বক-রক্ত-মাংস-রেত-স্বেদ-এ সবই ব্রহ্ম সত্যেরই জীবন প্রতিভাস। স্ব ঐশ্বর্য-অনিমা-মহিমা-লঘিমা-ব্যাপ্তি-প্রকাশ্য-ঈশিত্ব-বশিত্ব— এসবই ব্রহ্ম সত্যের প্রকাশাঙ্গ। ভাব সপ্তক-ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য - অজ্ঞান-অধর্ম-অবৈরাগ্য—সবই ব্রহ্ম সত্যেরই জগৎ বিকার। আত্মগুণ অষ্টক-দয়া-ক্ষমা-অনসূয়া-শৌচ-মঙ্গল-অকার্পণ্য-অস্পৃহা—এসবই ব্রহ্মভাব সংবেদে অঙ্কীকৃত। পঞ্চক্লেশ-অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ— এসবই ব্রহ্মসত্য থেকে স্বীয় উৎসাহে কৃত বিচ্যুতি। ব্রহ্ম চেতনের স্পর্শ থেকে সরে আসা অথবা ব্রহ্মচেতনের প্রভার বৃত্তে আসতে না পারাই হল সব বিচ্যুতির মূল উৎস। ভগবানকে বরণ করেই হয় ব্রহ্মচক্রে অবস্থান।

সর্ব আজীবে সর্ব সংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্
হংসঃ ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথক আত্মানং প্রেরিতারম্ মত্বা জুষ্টঃ তেন হংসঃ অমৃতত্বম এতি।। (শ্বেতাঃ উপ. ১/৬)

জীবের জীবনের স্বাভাবিক কাঙ্ক্ষিত অভিমুখ ভগবান। ভগবানকে জীবনে বরণ করতে প্রয়াসী হওয়াই জীবের জীবনের স্বাভাবিক প্রগতি। এগিয়ে যেতে হয় ভগবৎ পথের অভিযানে। যে পথে এগিয়ে গেলে আরও বেশি করে ভাগবতী উপলব্ধি জীবনকে বরণ করে নিতে পারবে, আরও বেশি করেই জীবন মাঝে সত্যস্নাত হতে পারবে। যে আগ্রহ ভগবানের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটিই জীবের জীবন পটে উপযুক্ত আগ্রহ, উদ্যোগ। অন্যথায় জেগে ওঠে বিস্মৃতি। ক্রম অভীপ্সায় বিস্মৃতি এসে অধিকার করতে থাকে জীবের অন্তর চেতনকে। এরই প্রভায় জীবন হয়ে ওঠে ক্রমে ভগবৎ বিচ্যুত। যে প্রভু এই জীবন এই জগৎ গড়ে দিয়েছেন, যাঁরই ইচ্ছার রূপমাত্রা হয়েছে এই মহাবিশ্ব, বিশ্বমাঝে যা কিছু সবই, সব জীবন, সব বাইরের আর ভিতরের যা কিছু সম্পদ সবই যিনি গড়ে তোলবার বীজশক্তি দিয়েছেন তাঁকে ভুলে যাওয়া জীবের শ্রেষ্ঠ ভ্রান্তি। ভগবানকে ভুলে যাওয়া হল জীবের অজ্ঞানতার ফসল। ভগবানকে বাদ দিয়েই যে জীবন-প্রাসাদ, সেটি প্রাণহীন এক জড় জীবন—যার পথচলার মধ্য দিয়ে অনন্ত সত্যের প্রবাহ থেকে বহু ব্যবধান ফুটে ওঠে আবার তাঁরই প্রেরণার সূত্র একটু মাত্রায় প্রাপ্ত হলেই জীবের হবে উত্তরণ।

উৎগীতম্ এতৎ পরমং তু ব্রহ্ম তস্মিন্ ত্রয়ম্ সুপ্রতিষ্ঠিতা অক্ষরম্।
অত্র আন্তরম্ ব্রহ্মবিদঃ বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণিঃ তৎপরা যোনিমুক্তাঃ।। (শ্বে. উ. ১/৭)

পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ জগৎ মাঝে ব্যাপ্ত ও নিহিত হয়ে রয়েছেন সর্বাবস্থায়। হেথায়, হোথায়, সেথায়— তিনিই নিহিত এই মর্তে, পাতালে ও স্বর্গে; তিনিই নিহিত জন্ম, গতি, মুক্তির সব পর্বে; আবার সেই তিনিই রয়েছে ধরিত্রী, অন্তরীক্ষ, আকাশে—তিনিই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন সর্বত্র। আবার সেই তিনিই মানব তনুতে হয়ে রয়েছেন লীন। তিনি সর্বত্রই অন্তরের বস্তু হয়েছেন, বিরাজ করছেন প্রতিটি কণায়-অণুতে-তনুতে। ব্রহ্মে লীন হয়েছেন তিনি আত্যন্তিকে।

যখনই জানা হয় ব্রহ্মের জগৎ অস্তিত্বে হয়ে যায় এই বিপুল বিশ্বের আত্যন্তিক সত্যকে গড়ে ওঠে আকর্ষণের তীব্রতা। তীব্র এই আকর্ষণের প্রভাব পেরিয়ে তখন আর জগতের মোহ ও মায়ার জাল জুড়তে পারে না। মায়ার জাল ক্রমপর্যায়ে যায় ছিন্ন হয়ে। হৃদয়ে তিনি স্বতঃই করেন অবস্থান এমন ভাব সন্নিবেশ হয় না। যে ভাব সন্নিবেশে জগৎ মাঝে ফুটে ওঠে ব্রহ্ম সনাতনের একত্বের প্রভা ঐ ভাব সন্নিবেশই তাঁর পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। জীবন কর্মের সব অবস্থায়, সব অবস্থানে এক ভাব সন্নিবেশ হয়ে উঠতে পারে স্বতঃই। এমন পরিবেশ জীবনে জাগরণের ক্ষণকেই করে সূচিত। জাগরণের প্রদীপ ভাস্বর হয়ে ওঠে নিত্য পথেণ সঞ্চালনে। এমন মনের

অবস্থায় জীবের জীবন মাঝে স্বাভাবিক মুক্তির ছন্দ ফুটে ওঠে। এই মুক্তি সব আবিলতার আবেষ্টন থেকে। এই মুক্তি স্বতঃই হয়ে ওঠে জীবনের জন্য পথপ্রসারী। জগতের পটভূমিতেই ব্রহ্ম প্রজ্ঞার চির আবেষ্টন এই মুক্তির স্বতঃ আহ্বায়ক জীবনে।

বিশ্বপথে এখন বিশ্বজয়ী ঃ যঃ ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বাৎ।
ঋষিঃ হোতা নঃ অসীদৎ পিতা নঃ।
সঃ আশীষ দ্রবিনম্ক এমঃ ইচ্ছমানঃ।
প্রথম উতঃ অবরান্ আ বিবেশঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮১/১)
বিশ্বমাঝে হয়েছে বিস্তৃত ঋষির প্রজ্ঞার দীপ্তি।
এখন অন্তরে বাইরে হয়েছে দীপ্ত ঋষির সত্য প্রদীপ।
জীবনের চলার পথের কর্মমার্গ হয়েছে দেবপ্রভায় স্থিত।
যে ভাবপথ হয়েছে মূর্ত জীবনের এই নিত্য পর্বের স্বরূপে
এখন করে অতিক্রম জগৎ বন্ধন হোক সে ভাবপথ মূর্ত।
প্রকাশ পথের এই নিত্য প্রবাহে হোক সাধনের স্থিতি।
দেবতার ঐ দেবচেতন এখন হয়েছে উন্মুখ উন্মোচনে।
আসুক ঐ পথমাঝে দেবতার আহ্বান নিত্য বিকাশ প্রয়াসে।।

বিশ্বমাঝে পূর্ণ প্রকাশে ঃ কিং স্বিত আসীৎ অধিষ্ঠানম্।
আবম্ভনং ঋতবৎ স্থিত কথঃ আসীৎ।
যবৌ ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা
বি দ্যাম ঔনাৎ মহিনা বিশ্বচক্ষুঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮১/২)
ঋষির এই জীবন ব্যাপ্ত সাধন প্রয়াসে এসেছে বার্তা।
ভগবৎ চেতনের স্পর্শে জীবনের জাগরণ প্রয়াসে।
এখন হোক উন্মোচন পরম চেতনের জগৎ প্রপঞ্চে।
ঐ মহাকাশের মহা বিকাশ পর্বের ব্যাপ্তিতে।
আদি সৃষ্টির কোন ভূমার কণা দিয়েছে তোমার বার্তা।
ধ্যানের গভীর পর্বে সাধকের চেতন শুদ্ধি হোক এখন।
ক্ষুদ্র জড়কণার গড়ন জগৎ মাঝে তোমারই বিন্যাসে
জীবনের আদি ক্ষণে—দিয়েছ অশ্বগতির প্রাচুর্য, হয়েছে পূর্ণ।।

একও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ ঃ বিশ্বত চক্ষুঃ উতঃ বিশ্বত মুখৌ।
বিশ্বত বাহু উত বিশ্বতঃ পাদঃ।
সং বাহুভ্যাং ধর্মতি সং পতত্রৈঃ।
দ্যাবাভূমিং জনয়ন দেবঃ একঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮১/৩)
অনন্ত অসীমে মহাশূন্যে মহাব্যোমে প্রসারিত তোমার দৃষ্টি।
বিশ্বময় সৃষ্টির সর্বত্র রয়েছে তোমার দৃষ্টির প্রকাশ সদাই।
অনন্ত অসীম সর্বত্র হয়েছে ব্যাপ্ত তোমারই প্রকাশ মুখ স্বতঃই।
ঋকের ছন্দের দৃপ্ত নন্দন হয়েছে বিশ্বময় ব্যাপ্ত একই মন্ত্রে।
হয়েছে তুমি বিস্তৃত সৃষ্টির সর্বত্র নিয়ে বিকাশ ধারা জীবনে।
এখনই এসেছে দৈব্য পথের নিত্য বিকাশ তোমারই স্পর্শের সামর্থে।
চরণ তোমার করেছে স্পর্শ অভীপ্সুর বিকাশ চেতন হস্তের কৃপাসঞ্চারে।
অনন্ত ব্যাপ্ত বিশ্বময় তুমি অনন্য এক ও অদ্বিতীয় শাশ্বত পরমপুরুষ সৃষ্টির।

পূর্ণ সত্যের দ্বার হবে উন্মোচন ঃ কিং খিদ্বনং কঃ উ সঃ বৃক্ষ।
আস যতৌ দ্যাবাপৃথিবী নিষ্ঠ তক্ষুঃ।

মনীষিনো মনসা পুচ্ছতে এতৎ।
তৎ যৎ অধ্যাতিষ্ঠো ভুবনানি ধারয়ন। (ঋ. বে. ১০/৮১/৪)
সৃষ্টির ইচ্ছা যখন হয়েছে মূর্ত পূর্ণ চেতন মানসে।
এসেছে দ্যোতনা প্রকাশ চেতনা বিপুল বৈচিত্রের এই চলমানতায়।
যেমন করে হয়েছে জীবনের মাঝে আহ্বান তেমনি এসেছে প্রসার।
যে সত্যের হয়েছে আহরণ এসেছে সময় তারই লালন বর্ধনের।
প্রশান্ত মনের গভীর উপলব্ধির এই ক্ষণপ্রভায় হয়েছে উদয়
অরণ্যের মহাবৃক্ষ এখন ভরপুর ঐ দৃপ্ত প্রত্যয়ের সহযোগে।
দৃঢ়তায় করেছে বরণ যে প্রাণ বিশ্বাস-ভালবাসার অগ্নি নিবেদনে।
হয়েছে পূর্ণ সত্যের দ্বার উন্মোচন এখন সাধন প্রাণের আকৃতিতে।

জীবের পরিচয়ের বিশিষ্টতা হল জীবের ক্ষুদ্রত্ব। ক্ষুদ্রত্বের মৌল উপাদান হয়েছে নিহিত জীবের মনের পরিচয়ে। বাসনার দড়ি দিয়ে বাধা জীবের মনের সব উপাদান। এটি এমন যে মনের মাঝে যে প্রসারণশীলতার শক্তি ও ধারা সেটিকে ক্রমে সঙ্কুচিত করে এক আশ্চর্য রকমের ক্ষুদ্রত্বে বেঁধে রাখে। ঐই ক্ষুদ্রত্ব জীবের অন্তরের বন্ধন দ্বারাই গড়ে ওঠে। অন্তর মাঝে জীবের প্রতীতি জীবনের ভাবপ্রবাহকে জীবন্ত ভাবধারায় বরণ করে নিয়ে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানকে করে দেয় সংকোচন।

সংযুক্তম এতৎ ক্ষরম্ চ অক্ষরম
ব্যক্তম্ অব্যক্তম্ ভরতে বিশ্বম্ ঈশঃ।
অনীশ ঈশঃ চ আত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ।
জ্ঞাত্বা দেবং মূচ্যতে সর্বপাশৈঃ।। (শ্বে. উ. ১/৮)

জীবের মাঝে জীবত্বের ভাবনাই সব ক্ষুদ্রত্বের উৎসমূল। জীবত্বের এই ভাবনার জালে আবদ্ধ জীব নিজেরই রচনা করা ক্ষুদ্রত্বের জালে হয়ে যায় বন্দী। যে মহাজীবন এই জীব ভাবনার মাঝে রয়েছে অবগুণ্ঠিত তার পবরিচয় হারিয়ে যায়। আমার কখনও যদি না ঐ পরিচয় ফুটে ওঠে তবে সেটি ক্রমান্বয়ে হয়ে যায় কুণ্ঠিত। সত্যের পরিচয় সরে যায় চেতনার পট থেকে। জেগে থাকে সত্যের এক জাগতিক সূত্র মাত্র। আংশিক সত্যকে মিথ্যার জালে জড়িয়ে ফেলে এমন চেতন অবস্থান। জীবনের এই সূত্রপথ ক্রম সঞ্চালনে হয়ে ওঠে জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে আর এক চৈতন্যের দিশা প্রাপ্ত হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে। সাময়িক তৃপ্তির যা কিছু রশদ, যা কিছু উপাদান সেসবই যেন অনিবার্য ভাবপথের মাঝে হয়ে ওঠে এক ক্ষুদ্র বাস্তবের পরিচয় বহনকারী। জীবনের পরিচয় ফুটে ওঠে ঐ ক্ষুদ্রত্ব আর তারই কিঞ্চিত ব্যাপ্তির পরিবেশে। যে জীবন এসেছে এই ক্ষুদ্রত্বের সীমায় তারই রয়েছে এখন জাগরণের সম্ভাবনা। ভগবানের সত্য প্রাপ্তি এখনও বহু দূরের বিষয়। ক্রম পর্যায়ে ঐ ভাগবতী সত্যের জন্য অনুসন্ধিৎসু হয়ে জীবনের এই ব্যাপ্তির প্রয়াসে যদি আসে জাগরণের আহ্বান সাধারণ পর্যায়ের এক জীবন মাত্রা হয়ে উঠতে পারে নতুন সত্যের স্রষ্টা।

প্রাজ্ঞো অজ্ঞৌ দ্বো এব ঈব অদৌ ঈশঃ অনীশৌঃ
একাহি ভোক্তৃ ভোগ্য অর্থযুক্তা।
অনন্তঃ আত্মাঃ চ বিশ্বরূপঃ হি কর্তা।
এয়ং যথা বিন্দতে ব্রহ্ম এতৎ।। (শ্বে. উ. ১/৯)

একই সঙ্গে অবস্থান করে হয়েছে ঐ বিরাট মাধুর্য । বিরাটের মাধুর্যের প্রধান হল ক্ষুদ্রত্বের কাছে হয়ে ওঠা এক অবলম্বন। এই অবলম্বন ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বকে বজায় রাখবার এক অনবদ্য অবস্থান। এমন অবস্থান যেখানে ক্ষুদ্রত্বের মৌল অভিব্যক্তিকে বেঁধে রাখতে আর প্রয়াসী হতে হয় না। বিরাটের নিত্য প্রবাহ নিত্য প্রবাহ ঐ ক্ষুদ্রত্বকে ধারণ করে তারই মাঝে গড়ে দিতে পারে আর এক পর্যায়ের ক্রম প্রসারী। জীবন সত্যকে এখন আর একটু বড় হয়ে ওঠে নিত্য দিনের মূর্ত প্রয়াসের ক্রম প্রসারী। জীবন সত্যকে এখন আর একটু বড় মাপের আর একটু ব্যাপ্তভাবে দেখবার জন্য সৃষ্টির নানা উপকরণ এখন জীবন সত্যের সব অঙ্গনকে ভরপুর করে দিতে পারে। এখনই রচিত হয় পূজা, যাগ, যজ্ঞের ক্রিয়াপর্বগুলি। পূজার এই পর্বের মাঝে হয়ে যায় পরম তৃপ্তির এক পরশ। মনে হবে এমন ভাব সন্নিবেশ যার প্রভা জগৎ মাঝে নিয়ে আসতে পারে আকর্ষণের প্রদীপ।

ক্ষরং প্রধানং অমূর্তঃ অক্ষরম্ হরঃ
ক্ষরঃ আত্মনাম এব ঈশতে দেবঃ একঃ।

তস্য অভিধ্যানাৎ যোজনাৎ
তত্ত্ব ভাবাৎ ভূয়ঃ চ অন্তে বিশ্ব মায়া বিবৃত্তিঃ।। (ঋ. বে. ১০/১৫/১০)

ব্রহ্ম প্রজ্ঞার সঞ্চার যখন হয়ে ওঠে সাধক বেরিয়ে আসে। জীবন এখন জীবের এই ভাবসংযোগ জীবনের জন্য এক উত্থানকারী, উত্থান উভয়বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহতের জীবন বৈশিষ্টের সঙ্গে অন্বীত হয়ে থাকবে। নিত্য বিবেক বিকাশী হয়ে জীবের জীবন এখন মহতের সঙ্গে হয়ে যুক্ত হয়ে উঠতে পারবে মহত্বের জীবনবিকল্পী। এই ভাবরাজ্যের রয়েছে যা কিছু বিশেষত্ব তাকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলবে জীবন রথটি। এখন দুই অবস্থা—এক, তিনি এই পরম সত্যকে দূরত্বে অবলোকনে কিঞ্চিত এক প্রজ্ঞার পরশ পেয়ে যায় এই জীবন। ঐ নিত্য-সনাতন পূর্ণ সত্যের ডালি নিয়ে নিজেরই এই অক্ষর পুরুষ এখন জাগ্রত অবস্থান। ইনিই প্রশান্ত ভাবসমন্বিত, বিরাট এখন ক্ষুদ্রকে বিশ্বময় গড়ে দিতে হবে অন্তরের ক্ষুদ্রতের স্থানেই বৃহতের বরণে।।

ব্যাপ্ত প্রকাশ ঃ

যা তে ধামানি পরমানি যাবমা।
যা মধ্যমা বিশ্বকর্মণ নূতে মা।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ।
স্বয়ং যজস্ব তন্বৎ বৃধানুঃ। (ঋ. বে. ১০/৮১/৫)

সৃষ্টির এই পর্বে গড়েছ তুমি নানা রূপের সম্ভার।
ঐ পরমের পটে হয়েছে তোমারই পরম প্রকাশ এখন।
আবার দিয়েছ গড়ে তোমারই সৃষ্টির মাঝে নানা প্রকৃতি।
করেছ বৈচিত্র জীবের নানা অবয়বে তোমারই হয়ে প্রকাশ রূপ।
ঐ প্রজ্ঞার পরশ জীবনের মাঝে দিয়েছে প্রেরণা রূপান্তরের।
যেমন ছন্দপ্রকাশ হয়েছে তোমারই ব্যাপ্ত জীবন সকাশে।
আসুক এখন জীবনের এই জগৎ মুখি প্রকাশ ক্ষণে সদাই।
তোমারই বিকাশ এই মহৎ সৃষ্টির সর্বত্র হোক প্রতিভাত অনুভবে।।

দিব্য আলোক ধারা ঃ

বিশ্বকর্মন হবিষা বাবৃধানঃ।
স্বয়ং যজস্ব পৃথিবী অমৃত দ্যাম।
মূহ্যম্ তনু অন্যে অভিতো জনাম।
ইহ অস্মাকং মখবা সুরিঃ ইহ অস্তু। (ঋ. বে. ১০/৮১/৬)

সৃষ্টির এই সীমাহীন বৈচিত্রের বিভিন্নতায় হয়েছে।
তোমারই কৃপার প্রবাহে হয়েছে সঞ্চার বিভিন্নতায়।
এমনই এসেছে নিত্য অনুভবের এই আবর্তের বিকাশে।
হয়েছে প্রকাশ তোমারই দিব্য আলোকের নিত্য প্রবাহে।
বিশ্বময় দিয়েছ যে কৃপার বার্তা ছড়িয়ে সকল প্রান্তে।
প্রাণে প্রাণে জেগেছে সঞ্জীবনের নবীন ভাবনার সাধন প্রয়াসে।
তোমার ঐ আশ্চর্য দীপময় আলোক সম্ভার বিশ্বময়।
ব্যাপ্ত আবর্তে হোক তারই প্রাবল্য জীবনপথের সঞ্চালনে।।

ব্রহ্মদীপ্তির প্রকাশ পর্বে ঃ

বিশ্বকর্মা বিমনা অদ্বিয় ইহ।
ধাতা বিধাতা পরমেত সংদৃক্।
তেষাম ইষ্টানি সমিষা মদন্তি।
যত্রা সপ্তা ধষ্ঠীন পরঃ একম্ আহুঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮২/২)

এখন মনের সমগ্রতায় হবে ধারণ ভগবৎ সাধন পর্বে
যে ভাব সংবেদ হয়েছে জাগ্রত সাধনে ভগবৎ নিবেদনে।
ঐ মন্ত্রের অঞ্জলি হয়েছে দেবতার প্রতি ভক্তিতে ভালবাসায়
এখন ভাবপ্রকাশ হবে জীবনের জন্য স্বাতন্ত্রের এই প্রবাহের ক্ষণে

ঐ অনন্তের এখন নিত্য ভাব বিকাশ নিত্য উন্মোচনের ক্ষণ।
অনন্ত সত্যের নিত্য প্রভা এখন জীবনের এই বিকাশ লগ্নের প্রকাশে।
হয়েছে ব্যাপ্ত ও মূর্ত সদা প্রত্যয়ের এই ক্ষণ মাধুর্যের অনুভবে।
ভূবন মাঝে এসেছে যে ব্রহ্মদীপ্তি এখন হয়েছে তার অবাধ প্রকাশ।

পূর্ণ জাগরণে দেবতার জীবন সংস্থান ঃ

যঃ ন পিতা জনিতা যঃ বিধাতা।
ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এবঃ।
তং সংপ্রশ্নং ভূবনা যন্ত্যন্যা। (ঋ. বে. ১০/৮২/৩)

পিতারূপে দিয়েছেন তিনি উপহার জীবচেতন জীবন মাঝে।
হয়েছে এখন নিত্য বোধ জগৎ মাঝে ব্রহ্ম চেতনের জাগরণে।
দেবতার পূজায় হয়েছে ব্যাপ্ত যে মানব চেতন এখন তারই উন্মেষ।
জীবন মাঝে অনুভবের এই একান্ত উন্মেষ হোক নিত্য ভাব সঞ্চারে।
তোমারই চেতনায় হোক দীপ্ত প্রাণের পরশ দেবছন্দের জগৎ উন্মোচনে।
এখন আসুক এই চেতনের পূর্ণতার অনুভবের আগ্রহের দেব সমর্থনে।
তোমারই ভাবদীপ্তি হোক জীবন মাঝে বহুত্বে দেবভাবের সংবেদে
আবার আসুক নিত্য ভাবদীপ্তির এই প্রসারে জীবনের পূর্ণ জাগরণে।।

ভগবানকে জানবার ইচ্ছা যদি জেগে ওঠে জীবনের মাঝে তবেই হয় জীবনপ্রদীপ জ্যোতির্ময় জাগ্রত। এই জাগ্রত ইচ্ছার ফলে যখনই ফুটে ওঠে জীবন মাঝে নানা প্রকারের মোহ ও মায়ায় জড়িত হয়ে থাকে জীবনের প্রদীপ শিখা। শিখাময় এই জীবন প্রদীপ হয়ে ওঠে জাগ্রত এই অনন্ত ভাব প্রবাহের মাঝে হয়ে স্বতঃই বিরাজিত। জীবনের দীপশিখা হয়ে যায় কুণ্ঠিত, এক পেশে। সার্বিক অনন্ত এই ভাব প্রবাহে জীবন হয়ে ওঠে গতিময়।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাপ, পাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশোঃ জন্মঃ মৃত্যুঃ প্রহানিঃ।
তস্য অভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহঃ ভেদেঃ।
বিশ্বৈঃ ঐশ্বর্যঃ কেবলঃ আপ্তকামঃ।। (শ্বে. উ. ১/১১)

ভগবানকে যে জানতে চায় তারই কাছে ফুটে ওঠে ভাগবতী পথের সাধন পথ। বহু সাধন ধারা, বহু পথ হয়ে রয়েছে সূচিত জীবনের জন্য। জীবন ব্যাপ্ত হয়ে থাকে সাধন। জীবনের পথ চলায় হয়ে রয়ে রয়েছে বিচিত্র সব সাধন পথ। এই বিচিত্র সাধন ধারার মধ্য থেকেই সাধককে বেছে নিতে হয় সেই সাধন যেটি তার জন্য হয়ে রয়েছে সবচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত। ঐ অনন্ত ব্যাপ্ত সত্যের মধ্য থেকে যে সত্যের প্রভা এই জীবনময় হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত তারই হবে দিগন্ত প্রসারী এক জাগতিক সত্যের ক্ষণ। জাগতিক সত্যই হয়ে রয়েছে জীবনের জন্য উন্মুক্ত। জাগতিক সত্য জীবনকে গড়ে দেয়। প্রতিদিনের পথ চলার এই পর্বে হয়ে থাকে বিরাজমান জীবনের এই এগিয়ে চলবার প্রয়াস। এগিয়ে চলবার এই প্রয়াসে দিন রাত্রির একত্রে হয়ে থাকা জীবন পথই হয়ে রয়েছে এই পথ প্রবাহে ক্রম সঞ্চারে সত্যকে খুঁজে নেবার প্রয়াসে। এই জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে জগৎ সত্যকে ঐ অনন্ত সত্যের প্রয়াসের মাঝে অন্বীত। এমনই হয়ে থাকে জীবনের মাঝে ব্যাপ্ত সব প্রয়াসীর জীবন প্রসার। জীবনের যা কিছু হয়ে রয়েছে দিগন্ত বিস্তারী সব সত্য। এমনই সব প্রয়াস হয়ে রয়েছে জীবনময় ব্যাপ্ত। এই ব্যাপ্ত চেতন হয়ে থাকে অনন্ত প্রসারী। যে ভাব সম্ভার হয়ে রয়েছে জাগতিক প্রভায় ভরপুর তারই সীমা অতিক্রম করে ব্রহ্মসত্যের প্রয়াসী হবে।

এতৎ জ্ঞেয়, নিত্যম এব আত্ম সংস্থম্।
ন অতঃ পরম বেদিতব্য হি কিম্ চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারণ চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম এতৎ।। (শ্বে. উ. ১/১২)

জগতের মাঝে ভগবানকে বরণ করতে চেয়ে যে ব্যবস্থাটি জীবন মাঝে হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত, তারই এখন হয়ে চলবে জীবনের প্রয়োগ ক্ষেত্রের অঙ্গ হয়ে ওঠার। ভগবানকে চাইতে হয় ক্রমাগতভাবে। প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের এই ভাগবতী অভীপ্সার ব্যাপ্তি হয়ে

চলে জীবন ময়। এমন জীবন বিকাশ ঘটে যাবে যেখানে নিত্যদিনের সব কর্মমার্গ থেকে এখন সব অন্ধকারের এই নিরশন হয়ে থাকে স্বতঃই জীবনের জন্য অনন্ত এক নিরলশ প্রয়াস। অন্ধকারের হাজার বছরের সঞ্চয় যেন মুহূর্তে পালিয়ে যায় ব্রহ্ম পথের অভিমুখের এই জীবন অভিযানে। এমনই হয়ে থাকে ক্ষণ যখনই হয় ক্ষণ এমন ভাগবতী স্বর্শের জন্য। যা কিছু জীবনের এই ক্লেশ পর্ব মুছে গিয়ে বিকশিত হয়ে যায় সত্য সূর্য জীবন মাঝে। এটি জীবন বিকাশ পর্বের নবীন সূচনার ক্ষণে ব্রহ্ম প্রাপ্তির ক্ষণ।

বহ্নেঃ যথা যোনি গতস্য মূর্তিঃ
নঃ দৃশ্যতে ন এব চ লিঙ্গনাশঃ।
সঃ ভূয়ঃ এব ন্ধিনঃ যোনিঃ গৃহ্যঃ
হস্তঃ দ্বয় উভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে।। (শ্বে. উ. ১/১৩)

নিত্য সনাতন স্বতঃই জীবনময় হয়ে রয়েছেন ব্যাপ্ত। আত্মারূপে জীবের অন্তরে সদাই তিনি বিরাজমান। তাঁকে জানা যায় না, চেনা যায় না। যেন লুকিয়ে রয়েছেন হৃদয়ের এক কোণে — যার খবর মন রাখে না; প্রাণ জানে না; এমনকি হৃদয়ও বোঝে না। মন ব্যাপ্ত জগৎ বিষয় নিয়ে। যা কিছু হয়ে চলেছে জগতে তারই খবর রাখতে ব্যাস্ত মন। শুধু খবর রাখা নয়, মন রয়েছে সর্বদা ব্যাপৃত ঐ ব্রহ্ম সনাতনের জগৎময় ছড়িয়ে রাখা মায়ার রাজ্যে। মন মোহের জালে বন্দী এক ছট্‌ফট্ করা মাছের প্রায়। চারদিক থেকে ধেয়ে আসা বাক্য, সংবেদ, ঘটনা, স্মৃতি, আবাহন, আকর্ষণ, যুক্তি ধার, জাগতিক বিচার, জাগতিক বিবেক, আর জীবন তত্ত্ব মনকে নিবিড় আচ্ছাদনে রেখেছে বেঁধে। জীবনের এই পথচলায় মনের খুব দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে থাকবার মত শক্তির সংস্থান করে দেয় প্রাণ। মন স্বাভাবিক ক্ষণে জড় প্রকৃতির। যা কিছু জড় বিকার, জড় বিস্তার এসবই মনকে সাথে নিয়েই ঘটে থাকে। জড় অবস্থান থেকে উত্তরণের সংহত করে এগিয়ে দিতে পারে মন। মন একদিকে জড়ের আজ্ঞাবহ-আধার। আবার অন্যদিকে মনই পারে জীবনপ্রেত পেরিয়ে ব্রহ্মপথে যেতে এগিয়ে।

দিব্য আলোকে প্রভায় প্রজ্ঞায়ন ঃ

সৌম এনঃ আদিত্যা বলিনঃ সৌমেন পৃথিবী মহী।
অথৌ নক্ষত্রেণ এন এযাম উপস্থে সোম আহিতঃ।
সোম মন্যতে প্রতিবান্। যৎ সংপিষন্তি ঔষধিতিঃ।
সোমঃ যং ব্রহ্মণো বিদুঃ। ন তস্যৎ অশ্রাতি কঃ চন।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২-৩)

ঐ আলোর প্রদীপ এখন জীবনের কাছে প্রকাশদীপ্ত।
বিশ্বমাঝে আলোর মালা এসেছে আদিত্য দেবের দিব্য আলোকে।
মহাকাশের সব তারকা নক্ষত্রাদি দিয়েছে আলোর প্রকাশ শক্তি।
এখন সাধন পথের মহাযজ্ঞে হয়েছে তোমারই দীপ্তির বিকাশ।
আলোর সাধন হয়েছে সূচনা সাধক জীবনের ধ্যানে প্রয়াসে।
তোমারই দেওয়া আলো শক্তির হয়েছে প্রয়োগ নিত্য ভাবমার্গে।
এখন হোক সাধন বিকাশ তোমার সাধন বিকাশের প্রেরণা সঞ্চারে
যে ভাবদীপ্তি দিয়েছে সাধন সুধা হয়েছে সে ভাবনার নিত্য প্রজ্ঞা চয়ন।।

চৈতন্যের দিব্য গতিমুখে ঃ

আচ্ছৎ বিধান যোগ এন অর্পিতঃ।
বার্হতঃ এব সোমঃ বক্ষিতঃ।
গ্রাম্বান্ এনঃ অশৃন্য এবম্ তিষ্ঠসি।
ন তে অশ্রাতি এব পার্থিবঃ।। (ঋ. ১০/৮৫/৪)

এই সাধন যজ্ঞের এখন এগিয়ে চলার পর্ব।
চেতনার এই জাগরণ ক্ষণে বিশ্বময় হয়েছে ব্যাপ্ত চেতন।
অন্তর মাঝে বাইরের সব নিয়ত প্রভার এই সমন্বয় ক্ষণে।
হয়েছে সাধন বিস্তার পরিণতির এই বিকাশ বিগ্রহে।
যখন হয়েছে মন্ত্রের নিবেদন এই ব্রহ্ম সাধন পর্বে
হয়েছে তোমারই বিচিত্র ভাবসঞ্চার জীবনময় ব্যাপ্ত চেতনে।
মহাকালের এই কালযাত্রায় এখন হয়েছে চেতন বিশ্বাসে ভরপুর।
তোমারই এই মহতী কৃপার দিব্য স্রোতপথে এগিয়েছে চেতন প্রবাহ।

সমান বায়ুর ধ্যান পথের প্রবাহে ঃ

যৎ ত্বা দেবঃ প্রঃ পিবন্তি।
তৎ আ অপ্যায় এসঃ পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য সদা রক্ষিতয়ঃ।
সমানাং মাসঃ নিত্য আকৃতিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৫)

সাধনের সূচনায় হয়েছে যে উন্মোচন নিত্য পথ চেতনে
এসেছে তারই প্রবাহের ক্ষণ জীবনর এই তীব্র স্রোতপথে।
হোক ঐ সাধন মার্গের উন্মোচন এখন চেতন দীপ্তিতে।
যে ভাবপ্রভা ছিল অন্তর মাঝে একান্ত প্রবাহের পরশে।
দিব্য পথের এই সাধন প্রয়াস সাধ্যের অনুভবে চলছে এগিয়ে।
এখন আসুক ঐ সাধন বিকাশ জীবনের অনন্য অনুভবে।
এখন ভাববিকাশের এসেছে ক্ষণ পরিণতির উপলব্ধির।
দিব্য ভাবসঞ্চারে ব্রহ্মপথের দিগন্ত প্রসারের এই ক্ষণে।।

সূর্যের জাগরণ পর্বে এখন ঃ

আরেভ্য আসীৎ অনুদেয়ী স্বতঃ।
নরঃ এষ পথ প্রবাহী অংশসী নোচনী।
সূরয়ঃ দিব্য ভাবম্ এষঃ ভদ্রম্ ইদ্বাসো।
সূরঃ গাথাঃ আয়েতি পরিষ্কৃতম্। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৬)

ঐ মহাসূর্যের দীপ্তি এখন নিত্য ভাবপ্রসারে।
হয়েছে যত উন্মোচন অখণ্ড ভাবপথের সঞ্চারে
এখন বিপুল এই ভাববিকাশ অনন্ত ভাবপ্রবাহের পর্বে।
দিব্য পথের সোধক এখন হয়েছে মন্ত্রের আবরণে সিঞ্চিত।
যে ভাবদীপ্তি হয়েছে বিকশিত হোক তারই তনু মাত্রায় ভাস্বর।
সত্যের এই ধারা চলেছে এগিয়ে হয়ে ভরপুর ব্রহ্মভাবে।
সূর্যদীপ্তির এই ক্ষণমাঝে জেগেছে দিব্যভাব সংবেদ।
এখন জীবনময় হোক সত্যেরই বিশেষ বিকাশপ্রবাহ।।

সাধন পর্বের রয়েছে যা কিছু স্পন্দন সবই হয়ে চলেছে জীবনের গুছিয়ে নেবার পর্বের একেকটি পর্ব। জীবন পর্বের যা কিছু অবলম্বন সবই একটি পর্বের যেন আবর্তন। এই পর্বগুলি সবই একমুখি। ভগবৎ উপলব্ধির জন্য জীবন যেমন করে আবর্তিত হয় তেমনিই। উপলব্ধির সূচনায় সাধকের প্রত্যয়কে অবলম্বন করেই এগিয়ে যেতে হয়। সাধনের পর্বে উপলব্ধি প্রবাহ জীবনের সূচনায় এসে জীবনে ভগবানকে ক্রমপার্যায়ে বরণ করে নেবে। অনিবার্য এই উপলব্ধির নিত্য প্রবাহ সাধককে একান্তভাবে মূর্ত করে দেবে তারই বেছে নেওয়া সাধন পর্বের অভিযানের মধ্য দিয়ে। যে ভাবপ্রবাহ এখন জীবনকে ভাগবতী পথ দেখায় তারই হয়ে ওঠে সময় ব্রহ্ম অভীপ্সায় ফুটে ওঠা আর বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করা।

স্বদেহম্ অরনিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তর আরণিং।
ধ্যান নিমর্থন অভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ।। (ঈশ. উ. ১/১৪)

উপলব্ধির সূচনায় ফুটে ওঠে একটি ধারার স্রোত। এই ধারার স্রোতে ভেসে যাবে জগতের সব আবিলতা, জগতের সবরকমের বন্ধন। এমন বন্ধন ইতিপূর্বে যা কিছুকে রুদ্ধ করে রেখেছিল সে সবই হয়ে যায় সাধন পথের প্রবাহে মুক্ত। সাধন পর্বে সাধককে হতে হবে একমুখি, এক মনের। নিজ দেহের প্রতিটি অঙ্গের মাঝে যে অন্তর চেতন রয়েছে ঐ অনন্তর চেতনকে করতে হবে জাগ্রত। সব অঙ্গের মাঝে রয়েছে ঐ চেতন প্রদীপ। যেন প্রতিটি ক্ষুদ্র কণা, প্রতিটি কোষের মাঝে নিষিক্ত হয়ে রয়েছে ঐ চেতন বস্তু। এটি ব্রহ্মবস্তু। একে জাগিয়ে তুলতে হয় ভাগবতী আবাহনের স্পন্দন দিয়ে। যে সত্যময় হয়ে ঋষিগণ হয়েছিলেন উপযুক্ত বেদপ্রজ্ঞার উদার উপহার পেতে ভগবান হতে, ঐ সত্যই জগৎ চেতনের ওই পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে অনন্ত ভাবময় এক চেতন প্রদীপ যারই হয়ে রয়েছে ঐ অনন্ত চেতন প্রকাশ স্বয়ংই সত্যপ্রদীপ উপহার দিয়ে যাবেন প্রাণে প্রাণে। যে প্রাণ চেয়েছে হতে ভগবানের তারই এখন ক্ষণ — হয়ে উঠবে। জীবনের এই পরম নিবেদনের ক্ষণটি সাধন মুখর প্রণব ধ্বনিতে হবে ভরপুর আত্যন্তিক নিজেকেই করে যজ্ঞে

নিবেদন। প্রতিটি কণায় রয়েছে নিজ চেতন বিন্দু। এখন সাধন পর্বের নিবেদনে নিজেরই যজ্ঞজীবন।

তিলেষু তৈলম্ দধিনী ইব আপঃ
সর্পিঃ স্রোতঃ সু অরনিষু চ অগ্নিঃ।
এবম্ আত্মা আত্মানি গৃহ্যতেঃ অসৌ
সত্যেন এনম্ তপসা যঃ অনুপশ্যতি।। (শ্বে. উ. ১/১৫)

ধ্যানের গভীরে প্রবেশ হলে সাধক তখন একমুখি এক মনের অধিকারী হয়ে উঠবেন। একমুখি একমনের হতে হলে ধ্যান তন্ময়তার অধিকার চাই। ধ্যান তন্ময়তায় সাধক শুধুমাত্র ভগবানকেই দর্শন করতে চাইবেন। ভগবানের কোন অনির্বচনীয় রূপ যার প্রভা স্বতঃই জীবনের মাঝে অনন্ত ভাবধারায় স্নাত হয়ে উঠবেন হয়ে একান্ত নিবেদক। নিজের সমগ্র চেতন প্রভা এখন একটি অনুসন্ধানে হবে ব্রতী। যে ভাবমার্গ এখন জীবনের সব ভাবনা, সব ভাবপ্রবাহকে একান্ত সংহত করে ভগবানে নিবেদন করতে হবে সক্ষম সেটিই এখন ধ্যানের গভীর পথে হৃদয়ের গূঢ় গুহায় চেতন প্রদীপকে এগিয়ে যাবে। বাইরের সব বিষয়াদি সব হবে লুপ্ত। এখন জীবনের কোনও চাওয়া-পাওয়ার হিসেবের অস্তিত্ব নেই। এখন স্থির অচঞ্চল এই মন জীবনের সামর্থ আর সব জ্ঞান প্রভাকে নিবেদন করবে ভগবানকে ক্রমশঃ সমগ্রতায়।

সর্ব ব্যাপিনম্ আত্মানম্ ক্ষীরে সর্পিঃ ইব অর্পিতম্।
আত্মবিদ্যা তপঃ মূলম্ তৎ ব্রহ্ম উপনিষৎ পরম্।
তৎ ব্রহ্ম উপনিষৎ পরম্ ইতি।। (শ্বে. উ. ১/১৬)

একান্ত নিবেদনের অভীপ্সা যদি হয় জাগ্রত তবে ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ংই ঐ নিবেদনের স্বত্ত্বাকে নিজ ক্ষেত্রে বরণ করে নেবে। অনন্যতার ক্ষেত্রবৈশিষ্ঠ এটি। এখানে সাধক প্রাণের মাঝে ভগবানের রূপটিকে ধারণ করে নেবেন একান্ত আপনত্বে। মায়ার জাল, মোহের অধিকার ছিন্ন করবেন একটু একটু করে। মায়ার জাল বিস্তৃত থাকে জীবনের সব ক্ষেত্রে। ভগবানকে তাঁর রূপময় লীলাসুন্দর রূপের প্রকাশে ভগবানের রয়েছে নানা লীলার পরিচয়। লীলা হল ভগবানের জগৎ ক্রিয়া। জগৎ ক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ রূপময় ভগবান এখন ভক্তপ্রিয় হয়ে উঠবেন। জগতের পটভূমিতে সাধক এখন কৃপার পরশ পেতে থাকবেন ঐ ভক্তির প্রদীপটি অন্তর মাঝে। এখন শিখায় ঐ ভক্তি প্রদীপ এখন ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করবে সহজ সাধন মার্গ। এই সাধন পর্ব হয়ে উঠবে জীবনের জন্য আনন্দের আবাহক। সম্পর্ক হবে প্রস্তুত ভগবানকে কেন্দ্র করেই এখন জলবে এগিয়ে সাধক জীবন ক্রমান্বয়ে চলবে ভগবৎ সান্নিধ্যেস্থ হয়ে প্রণত।

দিব্য চিন্তার প্রবাহে ঃ

চিত্তিরা উপবর্হনঃ। চক্ষুরা অভ্যনুনম্।
দ্যৌ ভূমিঃ ধ্বেশঃ আসীদ্। যজয়াৎ সূর্যায়াপত্তিম্।
স্তোমা; আসনং প্রতিষ্ঠায়ং কতুবীরং ছন্দে উ
সূর্যায়ে অশ্বিনা বরা। অ (ঋ. বে. ১০/৮৫/৭-৮)

চিন্তার প্রবাহ স্বতঃই হয়েছে আলোয় পূর্ণ এখন।
বিশ্বব্যাপ্ত ব্যবস্থার হয়েছে এখন দৈবী ভাবপ্রকাশের উন্মুক্ত ক্ষণ।
ঐ মহাসূর্যের মহাপ্রকাশ দিয়েছে নবীন আগ্রহের সম্ভাবনা
এখন হোক জীবন মাঝে তোমারই সূর্য প্রদীপ জাগ্রত।
এখন বিকাশের এই মহাপ্রদীপ দিয়েছে নবীন আলোক বার্তা।
যে জীবন প্রকাশ এখন এই সূর্য প্রভায় হয়েছে ভাস্বর স্বতঃই।
ঐ নিত্য প্রভাব স্বীয় মহিমায় হোক জাগ্রত জীবন প্রবাহ
জীবন প্রবাহের এই নিত্য স্থিরি নবীন প্রয়াস হোক স্থিত সময়ে।

দেবতার দান পর্ব ঃ

সৌ মৌ বধূঃ ইহ অভবৎ।
অশ্বিনা ইহ এতম উভাঃ বরা।
সূর্যঃ যৎ পত্যে সংসন্তৌঃ
মনসা সবিতাঃ আদদান।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৯)

মনের মাধুর্যের এখন ক্ষণ বিকশিত হবার

যে ফুলের প্রকাশ এসেছে দিব্য মনের গড়ে ওঠার পর্বে।
যে ভাব বিকাশ ছিল অধরা এখন হয়েছে তারই ব্যাপ্তি।
দেবসূর্যের এই বিকাশ পর্বের ছিল যা কিছু অবগুণ্ঠনে।
হয়েছে তারই প্রভায় দৃত বিকাশ অন্তরের গভীরে।
দাও তোমারই নিত্য বিকাশের একান্ত নিবেদনের এই ডালি।
দেবতার দান করে সংহত হোক জীবন অনুভবে পূর্ণ।।

মনের সীমা পেরিয়ে ঃ

মনৌ অস্যা অন আসীদ্। দৌরাসীৎ উত ঋধি।
শুকাবাৎ এবাহা হস্তাং। যৎ ইয়াৎ সূর্যাঃ গৃহম্।
ঋক্ সাম্ আমভিঃ অহিতো। গাবো তে সামনাবীৎ।
শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পন্থাঃ চরাচরঃ। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১০-১১)

প্রজ্ঞার রথ হয়েছে প্রস্তুত এখন নিত্য বিকাশের পর্বে।
যে মন ছল হয়ে নিবিড় অনুভবে ভরপুর জগৎ মাঝে।
এখন হোক উন্মোচন ঐ জীবন ধন ঐ অভিযানের প্রয়াসে।
মনের অঙ্গনে এখন সাধন পথের একান্ত অভিনিবেশ।
জ্যোতির্ময় তুমি দিয়েছ দিব্য জ্যোতির প্রবাহ জীবনের নানা পর্বে।
জ্ঞানের সঞ্চালনে হয়েছে আগ্রহের নিত্য উন্মোচন।
জ্ঞানের প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যাবে জীবনের সাধন পর্বে।
যে চেয়েছে হবে তারই নবীন চেতনের উন্মোচন প্রয়াস।।

মনের মাঝে দেবপ্রভা ঃ

শুচৌ তে চক্রে করি আস।
সঃ বুহ্য চক্রে অক্ষতঃ আহঃ।
অদৌ মনস সমর্থং সূর্য্যায় আরোহত প্রযুক্তি প্রত্তিম। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১২)

মনের মাঝে হয়ে থাকা বিপুল গতির প্রবাহ।
হয়েছে যবে নিবেদনের এই পর্বে সত্য উন্মোচন।
জীবন যাত্রার হয়েছে এখন নিপুণ সাধন দ্বার উন্মোচন।
যখনই হয়েছে মনের মাঝে রচনা আকৃতির রেশ।
এসেছে দেবপ্রভা ঋষির প্রত্যয়ে হয়ে সাধন
দেবতার দান এসেছে এখন জীবন মাঝে নিত্য প্রয়াসে।
ঐ ভাবরথ এখন চলেছে এগিয়ে স্বীয় মহিমায়।
যে সাধন স্থিত হয়েছে রচনা করতে আবাহন ব্রহ্মপ্রভা জীবনে।

মনের মাঝে গড়ে তুলতে হয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা। বিশ্বাস যখন সূত্রাকারে আসে জীবনের মাঝে তখনই এসে যায় একটি সম্ভাবনার সূত্র যার ফলেই গড়ে ওঠে এরই পর্ব থেকে এগিয়ে গিয়ে বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করেই এগিয়ে যেতে ভগবানের পথে। ভগবান স্বতঃই সাধন মনের নিবেদনের উপরই করেন কৃপার বর্ষণ। ভাগবতী কৃপায় সাধন মন ভগবানে পুনঃ পুনঃ নিবেদনের মধ্য দিয়েই উপলব্ধির প্রবাহ পেয়ে যাবেন।

যুজ্ঞানঃ প্রথমং মনঃ তত্ত্বায়ঃ সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নি চায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ।। (শ্বে. উ. ২/১)

মন যতই মুক্ত-যুক্ত হবেন ততই এগিয়ে আসবে জীবনের মাঝে ব্রহ্ম উপলব্ধির ক্ষণ। ব্রহ্ম উপলব্ধির এই সম্ভাবনার দ্বার তখনই উন্মোচিত হবে। এই সম্ভাবনারই প্রত্যক্ষ পরিণতি হয় জীবন মাঝে। পরিণতির রূপটি ঘটে যায় জীবন মাঝে মনের বিশুদ্ধি পথে এগিয়ে চলায়। মনের এই বিশুদ্ধি হল মুক্তি। এটি ষড় রিপুর বন্ধন থেকে। ষড় রিপুর প্রভাব থেকে মুক্তি। বাসনার জালে জড়িয়ে থাকা মানব মন মুক্ত। হয় ভগবৎ কৃপায়। মনের বিশুদ্ধির ক্ষণে জাগে মনের মাঝে বিশুদ্ধ ভাবনা। ভগবানের ভাবনাই পারে বিশুদ্ধির পথে নিয়ে যেতে। স্মরণ-মনন-লীলাকীর্তন এসবের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় মুক্ত মন। মুক্ত মন সব জড় বাধার প্রাচীর পেরিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। বাসনামুক্ত মনই দৃঢ় মন। বাসনার গণ্ডী পেরিয়ে যে মন মুক্ত হতে পারে, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় সে মন ভগবৎ ভাবনা করতে

পারে। ভগবৎ ভাবনার সূর হল এটি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অন্যদিকে যেমনই হয় ভগবৎ ভাবনার মধ্যে ডুবে যেতে পারে মনের দৃঢ়তায়। আপাত বিশুদ্ধ মনই এমন করে বিজয় লাভ করতে পারে এই জীবন মাঝে পরম বিশুদ্ধির পথ করে অবলম্বন। মনের বিশুদ্ধতা ক্রমে এগিয়ে যায়।

যুক্তেন মনসা রয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গোয়ায় শক্ত্যা।। (শ্বে. উ. ২/২)

বিশুদ্ধতার পর্বেই মনের মাঝে একাত্মতার বোধ ফুটে ওঠে। একাত্মতার বোধটি মনের গভীরে রয়েছে যে বিপুল ভাবসম্পদ তার জড় পরিচয়কে সরিয়ে দিয়ে মনের ব্রহ্মস্পর্শ আর ব্রহ্মদীপ্তির পরিচয় জীবন মাঝে এসে যায়। জীবনপ্রদীপ এখন মনের মাধুর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। মনের মাঝে ভগবানের স্পর্শ এসে যায়। এমন করেই হয় জীবনের মাঝে ব্রহ্ম পরশের আবাহন। যুক্ত মুক্ত মনই পারে ভগবানের ভাবনাকে জীবনের গভীরে নিয়ে যেতে পারে। ভগবান সদা উন্মুক্ত এই ভাগবতী ভাবনার গভীর অন্বয়কে জীবনের এই স্তরে স্তরে নিয়ে যায় আবাহনের পথ দিয়ে। এটি যেন একে অন্যের সঙ্গে সূত্রে গাঁথা। একটি থেকে অন্য পর্বে যখন চেতনার হয় গমন, যেন এক সূত্রের যোগমাত্রায় এদের হয় সংযোজন। এই সংযোজনের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে আবার বিশেষ প্রকাশমান ভাগবতী ভাবনার প্রবাহ। এমন ভাগবতী ভাবনা যা জীবনের সব বাস্তবতাকে ভগবানে করে যুক্ত। মন যেমন করেই যখন হয় যুক্ত তখনই গড়ে ওঠে ক্ষণ ভগবানকে নিজ জীবনে আপন করে নেওয়া। মন এমন করেই যখন হয় যুক্ত তখনই গড়ে ওঠে ক্ষণ ভগবানকে নিজ জীবনে আপন করে নেওয়া।

যুক্তায় মনসা দেবান্ সুবষতো ধিয়া দিবম্।
বৃহৎ জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্।। (শ্বে. উ. ২/৩)

জীবনের এই ক্ষণে মন-প্রাণ-হৃদয়ের সমন্বিত ভাবপ্রবাহ দিয়ে জীবন হয়ে ওঠে ভাগবতী তার ও ভাগবতী অনুভবের সঙ্গী। এমন ভাগবতী ভাবের প্রকাশ ক্ষণ হয়ে ওঠে রূপান্তরের কাণ্ডারী। রূপান্তরটি বোধে, চেতনায়। বোধে রূপান্তরের সূচনায় সাধকের নিজ জীবন ও অস্তিত্ব নিয়ে ওই বোধ জেগে ওঠে যেটি সাধকের ভাগবতী পরিচয়কেই জাগিয়ে তোলে। ভাগবতী এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সাধকের জীবন ক্ষেত্রের প্রত্যয় ফুটে ওঠে যে ঐ সাধন বিষয়টি স্বতঃ পরিচয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বিকাশের পটভূমি রচনা করে নিতে পারবে। সাধন প্রাণের প্রদীপ এখন হয়ে ওঠে নিত্য বিকাশের দৃপ্ত প্রকাশ। এই নিত্য বিকাশ পর্ব জীবনের সামগ্রিক প্রকাশ পর্বকে কেমন করে করবেন নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণটি জড় স্বভাবের উপর নিয়ন্ত্রণ। জড় বিকাশ স্বভাবতঃই হবে রূপান্তরিত। এই রূপান্তরের প্রবাহটি জীবের জীবন প্রবাহ মাঝে একান্ত নিবেদনে হয়ে উঠবে এই পর্বের মাঝেই হয়ে উঠবে একান্ত ভাগবতী এক চেতন প্রবাহ। মানবিক চেতন এখন এমন ক্ষণে হয়ে ওঠে ক্রমে ভাগবতী আলো দ্বারা হয়ে উঠবে চেতনময়। ভাগবতী আলোক জীবনের মাঝে আলোর পরশ নিয়ে আসে। এমন পরশই হয়ে যায় রূপান্তরের আহ্বায়ক। জীবনের মাঝে যে রূপান্তরের ঢেউ যখন জীবনের মাঝে আসে, মানব তনুতেই তখনই ফুটে ওঠে ভাগবতী চেতন।

জীবনে সত্যের সন্ধানে ঃ

সূর্যায়া বহতুঃ প্রাণাৎ।
সবিতা যমঃ এব অসৃজৎ।
অধাসু হন্যন্তে গাবৌ
অজুন্যোঃ পর্য্যুঃ হন্যতে।। (ঋ.বে. ১০/৮৫/১৩)

এখন দেবসূর্যের আবর্ত এসেছে জীবন মাঝে
ঐ আলোর ভাবধারায় হয়েছে নিত্য স্নাত এই জীবন।
সত্যের কণাসমূহ হয়েছে এখন উন্মুক্ত স্বতঃই।
সত্যের সন্ধানে হয়েছে ব্রতী যে প্রাণ হোক তার বিকাশ।
এখন হয়েছে নিত্য স্থিতি জীবন পথ করে মুক্ত উন্মোচনে।
যে ভাবপ্রদীপ ভগবৎ স্পর্শে হয়েছে দৃপ্ত উন্মুক্ত
হোক এখন পূর্ণ উপলব্ধির অভিমুখে সাধন চেতন সঞ্চালন।
বিশ্বমাঝে আসুক আলোর বার্তা জীবনের উন্মোচনের এ পর্বে।।

দিব্য আলোর নিত্য প্রভায় ঃ

যৎ অশ্বিনা কৃন্ত পুচ্ছমান এব আয়তং।
ত্রি চক্রেন বহতুং সূর্যায়াঃ।
বিশ্বে দেবাঃ অনু তৎ এবম্ অজানন্।
পুত্রঃ পিতরঃ এব বৃনীত পূষা।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১৪)

এখন এসেছে সময় অন্তরের জাগরণ তরে।
সাধন প্রবাহের এই ক্ষণ হয়েছে দেবসংযোগ বাহন।
যে ভাবদীপ্ত করেছে ভাস্বর জীবন মাঝে নিত্য আবেদনে।
এখন এসেছে সময় অন্তহীন এই ব্রহ্মস্পর্শের সাধনে।
দেবচেতনের হয়েছে এখন স্থায়ী প্রেরণার আহ্বান
ঐ অনন্তের এখন মূর্ত বায়ুর প্রকাশ হবে অন্তর মাঝে।
এই সৃষ্টির সার্বিক ক্ষুদ্রত্বের হোক অবসান হোক জাগরণ।
বিস্তৃত এই ভাবচেতন হোক ব্রহ্ম সাধনে যুক্ত মহত্বের প্রসাদে।।

মনের একাগ্রতায় আসে ধ্যান। ধ্যানে প্রবেশের আগে আসে ধারণা। সাধন পর্বে ধরণা হয়ে ওঠে ধ্যানের সূচক। ভগবানকে ধারণা করতে হয়। ধারণার মধ্যে কিছু মাত্রায় অনুমান আবার কিছু মাত্রায় থাকে যুক্তির ধার। এমন করেই গড়ে ওঠে ভগবানের জন্য আস্পৃহা। ভগবানের জন্য আস্পৃহা এমন হয়ে ওঠে যে ভগবান ব্যতিরেকে অন্য বিষয়, অন্য প্রসঙ্গের অবতারণার কোন সুযোগ তখন অপেক্ষায় থকে না। অন্য প্রসঙ্গ এমন ক্ষণে হয়ে ওঠে জীবনের জড় পরিচয়ে। আবদ্ধ হয়ে থাকা। ভগবানের জন্য মন ক্ষণে মনের প্রদীপ হয়ে যেতে পারে আকাঙ্ক্ষী। এই জীবন মাঝে এমন ক্ষণে ভগবানের জন্যই হয়ে ওঠে প্রাণের আকৃতি ও মনের নিবেদন। এই প্রবাহ পথে ভগবানকে বরণ করে নিতে হয় স্বতঃই। সাধন প্রাণ এখন ভগবানে নিবেদিত হয়ে জীবন মাঝে যে জড় উপাচার তারই পরশ নিয়ে আসে জীবনের রূপান্তর।

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতঃ বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেহ ইম্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিস্ফুতিঃ।। (শ্বে. উ. ২/৪)

রূপান্তরের প্রথম তাৎপর্য হল জীবন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানকেই করবে স্মরণ। উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, রূপান্তর পর্বে মানবিক চেতন হয়ে ওঠে ভাগবতী। এমন ক্ষণে বোঝা যায় ভগবানই স্বয়ং হয়ে রয়েছেন সর্বত্র। তিনিই প্রাণের গভীরে সব প্রাণের মাঝে নিয়ে আসেন ভগবতী বার্তা। ভগবতী বার্তা যখন বিশ্বাসে আসে ঘনীভূত হয়ে তখন হয় চেতনার রূপান্তর। চেতনা ক্রমান্বয়ে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে জীবনের পর্বে পর্বে। জড় ও জীবন উভয়েরই মূলে যে চেতনার আস্তরণ তারই এখন মৌল প্রবাহ — আর মৌল পরিচয়ে ব্যাস্ত। সাধন অনুভবে এখন ফুটে ওঠে ব্রহ্মচেতনের স্পর্শ। ব্রহ্মচেতন জীবনের মাঝে ফুটে ওঠে জীবন পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। এমন ভাবপ্রবাহে জীবন হয়ে ওঠে নিত্য ও সদা প্রবাহে হয়ে ওঠে নিজ পরিচয়ের মধ্য দিয়েই জানা যায় ঐ অজানাকে। চির অচেনা-চির অজানার এই পটভূমিতে ভগবানই হয়ে উঠবেন জীবনের জন্য দৃপ্ত এক সাধন চেতন। এরই প্রকাশ পর্ব চেতনার সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়ায় মূর্ত হয়। এমন ক্ষণ আসতে পারে যখন শান্ত-সমাহিত মনের অবলম্বনে জীবচেতন ব্রহ্মভাবপথে হয়ে উঠবেন নিশ্চিত প্রবাহে ব্যাপৃত।

জীবচেতন নিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরশ পথে এখন বুঝবেন ব্রহ্মচেতনই জীবের মৌল জাগৃতি। পর্থিব চেতনের দেনা-পাওনার হিসাব-নিকেষ পর্ব আর থাকে না। এখন জেগে ওঠে ভগবানের জন্য বিশেষ ভালবাসা। ভগবৎ ভালবাসা ক্রমে গাঢ় যতই হতে থাকবে ততই ফুটে উঠবে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা; হবে সাধকের নিশ্চিত ব্রহ্মলাভ এই জীবনে।

—ঃঃ—

সিঁড়ি

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

আজকাল সিঁড়ি বেয়ে উপরে
উঠতে গেলেই হাঁফ ধরে
কখনও মাঝপথে থেকে যেতে হয়
খানিক শ্বাস নিয়ে আবার আরোহণ
নশ্বর শরীরের হাড়মাংস স্পন্দন
ক্লান্তিহীন দাবিদাওয়া চাওয়া পাওয়া
কমা সেমিকোলোনের এমন উদার প্রয়োগ
কোথায় পূর্ণচ্ছেদ দাঁড়ি কোথায় যতি!
শেষতম ধাপের পর এবার কী তবে

অবরোহণের পালা অন্য যাত্রা
নিম্নগামী পথে দেওয়াল ধরে ধরে
হয়তো বা নেমে আসতে হবে
প্রারম্ভের বিন্দুটিতে যেখান থেকে শুরু
এমনও হতে পারে আরও আরোহণের পরে
সঠিক দিশায় ও পথে পৌঁছোতে হবে
আলোকোজ্জ্বল সেই অসীম শূন্যতায়
যেখানে সময় আকাশ মিলেমিশে সব
একাকার নির্বিরোধ ভেদাভেদহীন।

—ঃঃ—

ভগবানে ভক্তি

ভক্তিপ্রসাদ

ভগবান আমার একান্ত আপনার জন। তিনিই একমাত্র আপনার জন। তিনি ছাড়া এতো আপন আমার আর কেউ নাই। ভগবানকে আমাদের ভালো লাগে, আমরা ভরসা করি তখন যখন আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। আমরা সমস্যা জর্জরিত। আমরা কাঙ্খিত ধন লাভে অপারগ। অসুস্থ মানুষকে নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। হয়ত অর্থাভাব বা সম্মান হানিতে আমরা পর্যুস্ত। এই সময় আমরা ভগবানকে ডাকি। আমরা ভাবতে শুরু করি তিনি ছাড়া আমার কেউ নাই কিছু নাই। অর্থাৎ কোনো রকম কষ্ট পেলে, যন্ত্রণায় কাতর হলেই আমরা ভগবানকে ডাকতে থাকি। ভগবানকে আমরা কোনোদিন দেখিনি। তার সম্পর্কে আমরা জানি না। কোন মূর্তিতে তিনি বিরাজমান সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা নেই। আমরা ধরে নেই তিনি হলেন আমাদের রক্ষাকর্তা। আর কোনো উপায় নেই তাই ভগবানকে ডাকছি এই হলো আমাদের মানসিকতা।

কিন্তু আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এমন কোনো দায় ভগবানের নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজিত। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। প্রবহমান জলরাশি, সদ্য মুকুলিত কচি শাখা, মৃদু মন্দ বাতাস, ফুলের মিষ্টি গন্ধ, পাকা ফলের মিষ্ট স্বাদ, শিশুর হাসি ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই তিনি আছেন। তিনি আছেন সকলের মধ্যে। একটা যে বিশাল বড় বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানেও তিনি আছেন। তিনি আছেন অণুতে, পরমাণুতে। খারাপ, ভালো, ধনী, নির্ধন সবার মধ্যেই ভগবান আছেন। তাই তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আর ওনাকে স্মরণ করার কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা আমাদের বোকামির পরিচয়। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই যা যা দেখছি সব তাঁর সৃষ্টি। যার জগৎ তাঁকে কখন ভক্তি করব সেই ব্যাপারে চিন্তা করা শুরু করলে তাঁকে ভক্তি করার সুযোগ ছেথকে আমরা বঞ্চিত হবে। তিনিই তো আমাদের এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা চলাফেরা করছি, জ্ঞান অর্জন করছি, সৌন্দর্য ও সততা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছি। যদিও আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান চিন্তা আছে। পাশাপাশি যিনি আমাদেরএই চিন্তা করারসুযোগ করে দিচ্ছেন তাঁকে ভক্তি করা আমাদের প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্মরণশক্তি, রুচিবোধ, দায়িত্ব কর্তব্য পালনে স্পৃহা এ সবই ভগবানের দান। কখনও কখনও মনে হয় এই তো সুযোগ। যখন পারব, যতক্ষণ পারব আমরা ভগবানকে ডেকেই চলবো। কেন ডাকছি আমাদের জানার কী বা প্রয়োজন আছে। বাবা, মা কে সন্তান ডাকবে তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। শুদ্ধ অশুদ্ধর কোনো বাছ বিচার নেই। আমার ইচ্ছা আমি ভগবানকে ডাকবো। বিনা কারণে ডাকবো। ডাকতেই থাকবো। স্মরণ মনন করবো। মন প্রাণ দিয়ে শুধু তাকেই ভালবাসবো। বিড়ার ছানার মা র প্রতি যতটা নির্ভরতা তার চেয়েও অনেক বেশি নির্ভরতা নিয়ে ভগবানকে ডাকবো। এই হোক আমাদের ব্রত। আনন্দে ভরে উঠুক আমাদের জীবন।

—ঃঃ—

সৎ কর্মের অভ্যাস প্রয়োজন

সায়ক ঘোষাল

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাই ভগবৎ অভীপ্সার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার শুরু হল নিজেকে জানা দিয়ে। আমি কে, আমি কোথা থেকে অন্তর্ভুক্ত, জীবনের কী উদ্দেশ্য যখন এই প্রশ্ন জাগে মনে তখন শুরু হয় ধীরে ধীরে ব্রহ্ম অভীপ্সা। ব্রহ্মজ্ঞানের অংশ প্রত্যেকের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু সেটাকে মন্থন করলে সেটা সুপ্তই থেকে যাবে। সেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উত্তর মন নিজের থেকেই পাবে যখন মন নিজেকে মন্থন করবে। ঠিক যেমন দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পেয়েছিল ঠিক তেমন ভক্ত যদি মনের মন্থন করতে থাকে তাহলে ভগবানের কৃপায় সে তার উত্তর পেতে শুরু করে। ভক্তমন যদি উদ্যোগ নিয়ে একবার জানতে চেয়েছেন ভগবৎ জিজ্ঞাসায় তাহলে ভগবান স্বয়ং তাকে সাহায্য করে। এই মনই আবার নেতৃত্ব দান করে ভগবৎ বিরুদ্ধ হবার। তাই ভক্ত মনের চাই ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়ন্ত্রণ করার। ঠাকুর বলেছিলেন "মাছি সন্দেশেও বসে আবার বিষ্ঠাতেও বসে"। তাই মানব মনও তেমন দৈবী আসুরিক দুই স্বভাবের। তাই ভক্তের চাই মনের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করার। মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অভ্যাস করতে করতে একদিন সেই অভ্যাস শ্বাসকার্যের মতো হয়ে যাবে, এমনি এমনি। প্রতিনিয়ত মনকে সাধন কর্মে ডুবে রাখতে হবে। সংযম ও নিয়ামানুবর্তিতায় মন একাগ্রতায় হয়ে ওঠে ভরপুর। সেই একাগ্র চিত্ত মনই ভগবৎ সাধনে হয়ে ওঠে ভরপুর। আমাদের কর্মজীবনে ভগবৎ আরও ঘনীভূত হয়। যখন কর্ম ভগবানকে সম্পাদন করে করা হয়। তখন সেই জগৎ কর্ম দিব্য কর্ম হয়ে ওঠে। যখন ভক্তমন ভগবানকে স্মরণ রেখে কোনো কর্ম করে তখন তা হয়ে যায় কর্ম যজ্ঞ। তা মন ভগবানে অর্পণ করে তার দিব্য জীবনে উপভোগ করতে থাকে। মানব মনের সব থেকে দুর্বল অবস্থা হল গড়িমসি। যখনি কোনো কাজ মনে পড়ে করবো এমন মনে আসে তখনই

এটি হয়ে অভ্যাসে পরিণত এই অভ্যাস থেকে আসে অলসতা আর অলসতা থেকে আসে ভয়, কাজের ভয়, দায়িত্বের ভয়। তাই procastination অর্থাৎ গড়িমসি, কোনো কাজকে পিছিয়ে দেওয়া এইরকম যখনই আসবে মনে তখনই মনের বিরুদ্ধতা করাটা অতি প্রয়োজন। অলসতা হল মানব জীবনের এক অন্যতম শত্রু কারণ এটা মানব শরীরেই জন্মগ্রহণ করে এবং কর্ম হল মানব জীবনের এক বিশেষ মিত্রতা এবং এটি মানব শরীরেই জন্মগ্রহণ করে এবং কর্ম হল মানব জীবনের এক বিশেষ মিত্রতা এবং এটি অবনতি থেকে রক্ষা করে।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মনঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেৎ কর্ম্মনঃ।। গী (৩/৮)

ভগবান অর্জুনকে বললেন, তোমাকে কর্মের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কর্ম করা শ্রেয় অকর্ম হওয়ার থেকে। এমনকি শারীরিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা যায় না যদি কর্ম ত্যাগ হয়।

যতক্ষণ না মন এবং বুদ্ধি ব্রহ্মচেতনে নিবিষ্ট হচ্ছে ততক্ষণ জাগতিক কর্ম যদি ভগবান প্রদত্ত হিসেবে দায়িত্ব ভেবে পালন করা হয় 'তাহলে সেটি তার চিত্ত শুদ্ধিতেও সাহায্য করে এবং এই কর্ম সাহায্যে করে মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়মানুবর্তিতা পালনে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থৎ কর্ম্ম কৌন্তয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।। গী (৩, ৯)

"কর্ম হতে হবে যজ্ঞরূপী ভগবানকে সমর্থন করে নয়ত এটি জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। তাই হে কুন্তি পুত্র ভগবানেঃ সন্তোষ এবং আনন্দের জন্য কর্ম করো যা তোমার নির্ধারিত কর্ম, কর্ম করো কোনো আসক্তি না রেখে, কর্ম কোরো কোনো ফলের আশা না রেখে।" কর্ম যদি করা হয় মনের সন্তুষ্টি বা ফলের আশায়, মান যশ প্রতিষ্ঠানের জন্য তাহলে মন সর্বদাই বাধা পড়বে জাগতিক বন্ধনের মন একের পর এক অর্জন করতে থাকবে মনের সন্তুষ্টির জন্য কিন্তু মনের সন্তুষ্টি কখোনো করা যাবে না।

কিন্তু কর্ম যদি যজ্ঞ রূপে ভগবানের আনন্দের জন্য ভগবানকে কর্ম সম্পাদন করা হয় তাহলে মন জাগতীক সব মায়া বন্ধন কাটিয়ে ভগবৎ কৃপার অধীন হয়।

নিজেকে ভগবানে সম্পাদন করাই এই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। ভগবান সর্বক্ষণে, সর্ব জায়গায় উপস্থিত, এটাই তো সুযোগ সর্ব উপস্থিতিতে মনের তাকে চেনার। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে কোনো ঝড়-ঝাপটা আলাদা করতে পারবে না ভগবানের থেকে। বিশ্বাস হতে হবে বটবৃক্ষের মতো। জীবন কখোনো সমস্যা মুক্ত হয় কিন্তু যে সমস্যাকে নিজের ওপর প্রভাবিত করতে দেয় না সেই হয় ভগবৎ বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভরপুর ব্যক্তি। কর্মের মধ্যে বিশ্বাস এবং ভক্তি দুটি মিশে থাকলে সেই কর্ম হয় পরমব্রহ্মের আরাধনা। কর্মের মাধ্যমে ভক্ত হয়ে ওঠে নিখুঁত।

—ঃঃ—

ভগবানকেই চাই

তানিয়া ঘোষাল

ভাগবতী পথে পথে চলতে চলতে যখন সাধক ভগবানকে নিজ উপলব্ধিতে অনুভব করতে পারেন তখন তার থেকে আনন্দের কিছু এ জগৎ কেন, এই সৃষ্টিতে কিছু হয়না। যখন সাধক বুঝত পারেন যে যাকে সে এতদিন নিজের বিশ্বাসে লালন পালন করে এসেছেন, সে এমন একটু একটু করে সাধক প্রাণের কাছে ধরা দিচ্ছেন, তখন সেই প্রাণ আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এতদিন যিনি কল্পনায়, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, ভালোবাসায় ছিলেন, এমন সাধক জীবনের মধ্যে বাস্তবিকই তাঁর উত্তরণ ঘটছে। সাধক বুঝতে পারেন এক ভাগবতী অস্তিত্ব যেন সর্বদা তাকে বেষ্টন করে এক ভাগবতী অস্তিত্ব যেন সর্বদা তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। এ যেন সাধকের জন্য এক সুরক্ষাপ্রদানকারী, পথপ্রদর্শক বেষ্টনী যা সাধককে ধীরে ধীরে তার সাধ্যর অভিমুখে নিয়ে চলেছে। সাধক প্রাণ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। এই তো হচ্ছে। এই তো তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি সাড়া দিচ্ছেন। চাওয়াতে, না চাওয়াতেও তাঁর পরামর্শ আসছে। তিনি জীবনের খুব কাছেই যে অবস্থান করছেন তা সাধক চেতনায় উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তাঁকে পেয়ে জীবন আলোয় আলোয় ভরপুর হয়ে ওঠে। সাধক প্রাণ উপলব্ধিতে তাঁর এই ঝলককে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ভেবে বসে যেন সবটা পাওয়া হয়ে গেছে। সবটা জানা হয়ে গেছে। তিনি ভগবানের সবচেয়ে কাছের। তাঁর থেকে কাছের। আপন ভগবানের আর কেউ নেই। আর তার সাধন ভজনের দরকার নেই। এবার মা হবে তা এমনিই হবে। এটাই বোধ হয় সাধক জীবনের এক অন্যতম চরম ভুল। জীবনের যে কোনো আঙ্গিকে over-confident বোধ হয় কম, তাই সহায়তামূলক হয় না। সাধক মনের উপলব্ধিতে তাঁর সেই

অবাধ যাতায়াত যেন কিছু কিছু করে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। সাধক, সাধ্যর সেই সাধন যোগাযোগ যেন কিছু কিছু করে ক্ষীণ হতে থাকে। উপলব্ধির তীব্রতা যেন ক্ষীণ হয়ে আসে। সাধন দৃষ্টিভঙ্গিরও বেশ আমূল পরিবর্তন ঘটে। জীবনটা সেই রোজকার রুটিনের মধ্যেই চলছে। জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষ, গাছপালা পশুপাখি, অফিস কাছারি, সংসারের আর পাঁচটা কাজ সবই একই থাকে, কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যে যে একটি দৈবী ছন্দ কাজ করত, যে ভাগবতী প্রভা জীবনের সব অংশকে জড়িয়ে থাকত, প্রতিটি ক্ষণে সাধক মন যার উপলব্ধিকে যার উপস্থিতিকে মনের খুব কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত, সে কোথায় একটা চলে গেলেন। আর তো তাঁকে ধরা যাচ্ছে না, কথা শোনা যাচ্ছে না, তাঁকে অনুভব করা যাচ্ছে না। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সবটা কেমন অন্ধকার। কোথায় গেলেন তিনি কোথায় গেল সেই আনন্দের আলো। কেন তাকে আর এমন উপলব্ধিতে ধরতে পারে না। কর্মে, ধ্যানে জ্ঞানে তাঁকে অনুভব করতে পারে না। কেমন যেন জড়ভরত অবস্থা । কেন যে এমন হল। সাধক অহং বড় সর্বনাশা। কোথায় পাই তাঁকে এবার। কেমন করে ফিরিয়ে তাঁকে আবার, তিনি কি আর আসবেন। আর ফিরে চাইবেন। আবার কি সেই আগের মত আনন্দে-সংলাপ হবে। সাধক প্রাণের কেন এই অধঃপতন।

সাধন আনন্দে ঃ যে যজ্ঞের সূচনা হয়েছে জীবনের সাধনে
এখন সময় এসেছে ঐ যজ্ঞের ব্যাপ্তির প্রয়াসে
এখন দেবতার এই মন্ত্রের সাধনে হোক স্ফূর্তি
তোমারই প্রয়াসে যে নিবেদন করুক তা আহ্বান
আবারও ঐ সাধন প্রয়াস হোক সাধন পরিণতি
অবাধ গতির এই ভাগবতী অভিমানে করি বরণ
উপলব্ধির ভাবপ্রয়াস জীবনের হোক প্রভাময়।
(বেদ বিজ্ঞানের গভীরে, ড. রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, P-27)

তাঁকে একটু পেয়ে, তাঁর একটু পরশ, একটু ঝলক পেয়ে থেমে যাওয়া নয়। আরও এগিয়ে যাওয়াটাই সাধন প্রাণের কর্তব্য। তিনি তো কোথাও যান না। তিনি হৃদয় গুহায় চিরকাল ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তাঁকে নিজেদের মধ্যেই আমরা বহন করছি। কিন্তু চেতনহীন হয়ে। যখন তিনি ধরা দেন তখন তাকে কখন কখনও কেউ বড় taken for granted ধরে অবহেলা করে ফেলে, তখনই সাধক প্রাণের অন্তর্দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি সামনেই বিরাজ করছেন কিন্তু নিজেরই দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁকে দেখতে পাই না, শ্রুতির সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁকে শোনা যায় না, মনকে ঘিরে ধরে নানা বৃত্তি যার ফলে মনটাও কালো মেঘে ঢেকে যায়, দেব সূর্য সেই মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে ফেলেন নিজেকে। এর থেকে মুক্তির উপায় স্বয়ং তিনি নিজেই। যদি সবটা বাদ দিয়ে, সব প্রশ্ন, উত্তর, মান, অভিমান, সংশয়, সন্দেহ সবটা ফেলে রেখে যদি তাঁকে এবং একমাত্র তাঁকেই আকড়ে ধরা যায়, তবে সব মেঘ, সব অন্ধকার কেটে যাবে। এই অতি সাধারণ একটি প্রাণের স্থির বিশ্বাস তিনি আরেকটিবার সুযোগ দেবেন নিশ্চয়ই। আরেকটি বার তাঁকে আগের থেকেই আরও বেশি কাছের করে পাওয়া যাবে। এবার তাঁকে আরও কাছ থেকে জানা যাবে। তিনি হাত ধরে তাঁর সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই। আবার তিনি জীবনের উপলব্ধিতে ধরা দেবেন নিশ্চয়। আগেরমতই আবার সেই সম্পর্ক আগের থেকেই গভীর কিন্তু অচল, অটল হবে। তিনি হাত ধরে পার করে দেবেন এই অন্ধকার পথ। আবার দেবসূর্যের নরম আভা সাধক প্রাণকে আলোকিত করবে। জীবনের উদ্দেশ্য পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেবে। সাধক প্রাণের দৃষ্টিতে, শ্রুতিতে তিনি পুনরায় ধরা দেবেন। সাধক প্রাণকে হাত ধরে এগিয়ে দেবেন সেই পরম সত্যের দিকে।

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে

আশুরঞ্জন দেবনাথ

কেয়াতলা ঃ ১০/০৩/৬৮ রবিবার—চতুর্দশ-দর্শন।

আবার আগে স্বামীজির চিঠি পেয়েছি। হৈমবতী নরেন্দ্রপুর থেকে ২৩/২/৬৮ তারিখে লিখেছেন,

আমি ব্যক্তির চাইতে তত্ত্বকে মর্যাদা দিই বেশি। তত্ত্বে একটা শাশ্বত রূপ আছে। ব্যক্তিতে তা বদলে বদলে যায় বা বহুরূপী হয়ে দেখা দেয়। তাকে ধরা বড় শক্ত। আমি সে চেষ্টা করি না।

অবতার আর গুরু ওতপ্রোত। অবতার মানে তাঁর নেমে আসা। তিনি সৃষ্টিতে নেমে এসেছেন সুতরং সমস্ত সৃষ্টিটাই অবতার 'Universal Incarnation'। কিন্তু সৃষ্টিতে শক্তি প্রকাশের তারতম্য আছে। কোথাও শক্তির প্রকাশ সহজ এবং নির্বাধ। ফুলের ফুটে ওঠার মত। অবতারকে মনে হয় তাই। আবার কোথাও অনেক বাধা ঠেলে তার প্রকাশ হয়। তখন আর অবতার নয়—উত্তর কিনা উজান ঠেলা। মানুষ গুরুরা উজান ঠেলে গুরু হন। উজান ঠেলে যেখানে গিয়ে হাজির হন, সেখানে অবতার আর গুরু এক। আবার তেমনি অবতারও জগদ্‌গুরু।

অরবিন্দ গুরু না অবতার তিনিই বলতে পারেন। বললেও তার অর্থ কি, তা আশা করি ভাল আছ।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

বেলা তিনটা। নির্ধারিত সময়ে এসে পৌঁছালাম। স্বামীজি একাই বসেছিলেন। হয়তো আমারি প্রতীক্ষায়। সময় আগেই দিয়েছিলেন। নতুবা সাধারণত স্বামীজি এ সময়ে বিশ্রাম নেন। প্রণাম করে পাশে বসলাম। স্বামীজি বললেন, বল তোমার কি বলার আছে। আমি চারটায় উঠে পড়ব। এরি মধ্যে লোকজনও আসতে পারে। আমি খানিকক্ষণ চুপ থেকে ধরা গলায় ধীরে ধীরে বললাম স্বামীজি আমার ভয় হচ্ছে। 'কেন, কিসের ভয়?' বললাম আমি কি আপনার স্নেহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি? এবারে স্বামীজি অবাক বিস্ময়ে বললেন, 'তুমি একথা ভাবছ কেন? একটা চিঠির জবাব দিই নি বলে?' 'তোমার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। লিখতে শুরুও করেছিলাম। কিন্তু পনেরো মিনিটে তোমার দু'পৃষ্ঠার চিঠির জবাব সম্ভব নয়। তাই কতগুলি-জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি' বলে স্বামীজি শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলাম সে সবের সুন্দর সংক্ষিপ্ত সমাধান দিলেন।

(এখানে একটি কথা বলে রাখা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বামীজি সাধারণতঃ মাসে একদিন কি দুইদিন চিঠি লিখার জন্য রাখতেন। চিঠি পেতেন অজস্র; নানা জনের, নানা প্রশ্ন। স্বামীজি প্রতিটি চিঠির জবাব দিতেন। তাই একটি চিঠির জবাবে সাধারণতঃ ১৫ মিনিটের বেশি সময় দিতে পরতেন না। অবশ্য ব্যতিক্রমও সে ছিল না এমন নন।)

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ" পড়ে স্বামীজিকে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলাম। তারই জবাবে স্বামীজি "প্রসঙ্গক্রমে আরও বললেন, "শ্রীঅরবিন্দের জীবনে নারীর স্থান নেই একথা একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং তাঁর জীবনে নারীর স্থান অনেক উঁচুতে। মৃণালিনী দেবী ছিলেন ব্রাহ্ম মতের মেয়ে। তাই প্রথম জীবনে শ্রীঅরবিন্দকে অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কিন্তু শেষ জীবনে মৃণালিনীদেবী অরবিন্দময় হয়ে গিয়েছিলেন। সেই পাওয়া ও কি কম? শুধু কাছে থাকলেই কি পাওয়া হয়? আবার দেখ আশ্রম জননী শ্রীমাকে। ফরাসীর মেয়ে শ্রীমা। তারই তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠল আশ্রম। শ্রীঅবিন্দ মায়ের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এই মা না এলে আজিকার আশ্রম গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ। মা নিজেও বলেছেন " Without him, I exist not; without me, he is unmanifested". "শ্রীঅরবিন্দ বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্ব নেই; আর আমায় ছাড়া তিনি অপ্রকাশ।"

শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন, মায়ের আবির্ভাবে তাঁর দশবছরের সাধনা এক বছরে সম্ভব হয়েছে। আশ্রমের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মায়ের উক্তি মনে পড়বে, "তাঁর সঙ্কল্প, আমার সম্পাদন।" *** ***

"শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন, একথাও সত্য নয়। কংগ্রেসের সাথে তাঁর বরাবরের যোগসূত্র ছিল। আমারি এক বিশেষ বন্ধু যিনি রাজনৈতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জন্য পণ্ডিচেরী ছুটে যেতেন। তাঁর পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সাথে দেখা করার কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব খবরই ওনি রাখতেন। ক্রীপস্ প্রস্তাবের জন্য (The Cripps Mission) শ্রীঅরবিন্দ ক্রীপস্‌কে অভিনন্দন জানালেন এবং তার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমাদের নেতাদের অনুরোধ জানালেন। দিল্লিতে দূত পর্যন্ত পাঠালেন। সুতারাং রাজনীতির সাথে শ্রীঅরবিন্দের যোগ ছিল না, একথা ঠিক নয়।" *** ***

(এ সম্পর্কে আরও বিশদে জানতে চাইলে আগ্রহী পাঠক নীরদবরণের "শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বারো বছর" বইটির 'যুদ্ধ ও রাজনীতি' অধ্যায়টি দেখতে পারেন।)

প্রসঙ্গত শারীরিক জড়তার কথা বললাম। স্বামীজি, ব্যায়াম আসন মুদ্রার কথা বললেন। সময় হয়ে এল। ইতিমধ্যে আরও দু'চার জন অনুরাগী ভক্ত এসে বসলেন। কবে ফিরব, ছুটি কত দিনের ইত্যাদি খোঁজ-খবর নিলেন। স্বামীজি কবে থেকে কতদিন বাইরে থাকবেন বলে সে অনুযায়ী চিঠি লিখতে বললেন। চারটে বাজলে স্বামীজি উঠলেন। পাঠমন্দিরে স্বামীজির ভাষণ আছে। আমিও প্রণাম করে বিদায় নিলাম। স্বামীজির সান্নিধ্যে একঘণ্টারও বেশি সময় ছিলাম।

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে স্বামীজি শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের উপর দীর্ঘদিন নিয়মিত ভাষণ দিয়েছেন—দিব্যজীবন প্রসঙ্গ, যোগ-সমন্বয় প্রসঙ্গ, সাবিত্রী প্রসঙ্গ। এমন কি স্বামীজি যখন শিলং ছিলেন তখনো তার ব্যতিক্রম হয়নি। কোনদিন স্বামীজির ভাষণ শোনার সৌভাগ্য

হয়নি। অথচ তার সুযোগ-সুবিধা ছিল। সে সুযোগ হেলায় হারিয়েছি। আজ ভাবতে বড় কষ্ট হয় সেদিন অবহেলায় কতবড় সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব!

*** *** ***

নরেন্দ্রপুর; ৮/১০/৬৮ মঙ্গলবার। পঞ্চদশ দর্শন।

সাক্ষাতের সময় বিকাল পাঁচটা। সুদীর্ঘ ৮ মাস পর। উন্মুখ হয়ে রয়েছি সারাটা বছর। দুরু দুরু বক্ষে ছুটে এসেছি সুদূর গৌহাটী থেকে। বাসে গড়িয়া হয়ে নরেন্দ্রপুর পৌঁছালাম বিকাল সাড়ে চারটায়। চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি এল ঝেপে। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। বৃষ্টি কমছে না। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল সন্ধ্যা না হতেই, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এত দিনের প্রতীক্ষা বুঝি আমার বিফলে যায়, এত কাছে এসেও বুঝি দেখা পেলাম না। অনেক ভেবেচিন্তে একটা রিক্সা ঠিক করলাম ঃ—দেড় টাকায়। মিনিট দশেকের পথ। শেষ অবধি রিকস্াকে দু'টাকা দিতে হয়েছিল, অনেকটা সময় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম বলে। তবুও আমি কৃতজ্ঞ, সময়মত পৌঁছুতে পেরেছি।

হৈমবতীর সামনে এসে দু'চার বার হর্ন বাজালে বাগানের মালী এসে গেট খুলে দিলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম স্বামীজি ঘরেই আছেন। বৃষ্টি তখনো কমেনি। স্বামীজি বারান্দায় এসে দাঁড়ালে প্রণাম করলাম। স্বামীজি ঘরে নিয়ে বসালেন, বললেন, 'ঘরে এস, এখানে বড় হাওয়া'। স্বামীজি তাঁর বিছানায় বসলেন। ছোট একখানি খাট, তার উপর শ্বেত-শুভ্র বিছানা পাতা। আমি বসলাম সামনে মুখোমুখি একটু দূরে শান্তিনিকেতনী মোড়ায়। আমার বাঁপাশে বড় বড় বইয়ের আলমারী ডানদিকে স্বামীজির লেখাপড়ার টেবিল। টেবিলের সামনে একখানি ইজি-চেয়ার মৃগচর্ম বিছানো। টেবিলের মাঝখানে সরস্বতীর ফটো নানা ফুলে সাজানো, তদপেক্ষা আরেকটু দূরে টেবিলের বাঁ কোণে মা দুর্গার ছবি তেমনি ফুলে ফুলে সাজানো। মা দুর্গা স্বামীজির আরাধ্যাদেবী হৈমবতী—। নানা ফুলের মধ্যে দেখলাম পদ্ম, গোলাপ, শিউলী আরও কত কি। ফুলের গন্ধে সারাঘর আমোদিত। টেবিলের ডান কোণে অনেক বই, তার মধ্যে সদ্য প্রকাশিত শঙ্করী প্রসাদ বসুর 'লোকমাতা নিবেদিতা' বইখানিও রয়েছে। টেবিলের বা দিতে একটা বইয়ের রেক (Rack) ; তার শেষ বইখানি ইংরেজী Gardening সম্পদকীয়। স্বামীজির ফুলের বাগানও ফুলে ফুলে ভরা। দোর গোড়ায় একটা শিউলী গাছ। ফুল বাগানের শখ স্বামীজির বহুদিনের। যেখানেই থেকেছেন, সযত্নে নানা ফুলের বাগান গড়ে তুলেছেন—তা সে হিমালয়ের কোলে আলমোড়ায় হউক, কিংবা পাইন বনের শিলংই হউক। দেশী -বিদেশী নানা ফুলে ভরা থাকত স্বামীজির বাগান।

পরে জেনেছি টেবিলের ছবিদুটি "তন্ত্রাভিলাষী সাধুসঙ্গ" গ্রন্থের প্রণেতা প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা। শিল্পী স্বামীজিকে উপহার দিয়েছেন। ছবিদুটির প্রতিচ্ছবি এখন অনেক অনুরাগী ভক্তজনদের কাছেই আছে; আমার কাছেও রয়েছে। প্রসঙ্গত ঃ মনে পড়ছে পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরী গেলে শিল্পীর সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য। শিল্পী আমায় পরম স্নেহে তাঁর স্টুডিওতে নিয়ে বসান। তাঁর আঁকা ছবিতে ঘরভর্তি; কোনটা সবে শুরু করেছেন; কোনটা বা অসম্পূর্ণ। আমায় বললেন পছন্দমত ছবি বেছে নিতে। আমি সাহস করিনি। মাপেও বড় ছিল। নিয়ে আসার সুবিধা ছিল না। আমি তো ছিলাম সে যুগের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। Reservation -এর বালাই ছিল না। তথাপিও আজ মনে হয় একটা দুর্লভ সুযোগ হারিয়েছি। ইচ্ছা করলেই পছন্দমত একটা ছবি নিয়ে আসতে পারতাম। সে হত আমার অমূল্য সম্পদ।

জাতিভেদ সম্পর্কে স্বামীজিকে কিছু প্রশ্ন করে পাঠিয়ে ছিলাম। তারই জবাবে স্বামীজি হৈমবতী নরেন্দ্রপুর থেকে ৩/৩/৬৭ তারিখে লিখেছেন,

জাতিভেদ এখন যে আকারে আছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন। আদৌ বৃত্তির (livelihood) ব্যবস্থা থেকে এ প্রথার উদ্ভব। যে যে কাজ করে তার সে বিষয়ে একটা aptitude থাকে—সেটাই তার গুণ। কর্মের ভিতর দিয়ে এই গুণ সন্তানে সংক্রমিত হবারসম্ভাবনা থাকে। জাতিভেদ জন্মগত হবার পক্ষে এইটুকু যুক্তিই আছে। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে জাতি-ব্যবস্থার অদল-বদল করা উচিত। আগে তাই করা হত—স্মৃতিতে তাকে বলে জাত্যুৎকর্ষ বা জাত্যপকর্ষ অর্থাৎ কাউকে গুণের জন্য জাতে তোলা, দোষের জন্য জাত থেকে নামিয়ে দেওয়া। এদেশে মুসলমান আক্রমণের পূর্বপর্যন্ত এ ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান আক্রমণের পর থেকে সমাজ কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছে। তার ফলে ওই জাতিভেদের অনড় প্রতিরোধের দ্বারা হিন্দুত্বকে সে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। নইলে মুসলমান যেখানে গেছে, সেখানেই সে সবাইকে মুসলমান করে ছেড়েছে।

আজ হিন্দু স্বাধীন। এখন তার উচিত জাতিভেদকে নতুন করে গড়া—তাকে গুণগত ও কর্মগত করা। স্বভাবে যতটা সে বংশগত হয় হ'ক। কিন্তু তাকে আচারগত না করা। রুটি আর বেটী নিয়ে জাতিভেদ। একে উড়িয়ে দেওয়াই উচিত—অন্তত রুটির বেলায়। ছুঁতমার্গ পরিহার করলে জাতিভেদের বিষদাঁত ভেঙে যায়। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী তাই করেছেন। তার আগে ওকউ এটা করেনি—সমস্ত ভারতবর্ষকে আজকের মত এক নজরে দেখতে পারেননি বলে। কিন্তু বৌদ্ধভারতে ছিল না। সুতরাং জাতিভেদকে গাল দিলেও দেওয়া ঠিক নয়। ভাঙ্ ভাঙ্।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

ঘরে বসতেই স্বামীজি বললেন, 'বল তোমার কি বলার আছে, বলে স্বামীজি নিজেই জাতিভেদ সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন আমার পূর্ববর্তী চিঠির প্রসঙ্গ টেনে। স্বামীজির সেই সুন্দর যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ কথোপকথন কতটুকুই বা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পেরেছি, যতটুকু পেরেছি তারই কিছুটা বলছি। আজকের মত সে যুগে যদি মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা থাকত! সে যুগের Tape recorder বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত সুযোগ সুবিধা আমার ছিল না; সামর্থও ছিল না।

ছোট ভাই তার দাদাকে প্রণাম করবে এতে যেমন অবমাননার প্রশ্ন ওঠে না; তেমনি অব্রাহ্মণ ব্রহ্মাণকে প্রণাম করবে এতে অবমাননা কোথায়? ত্যাগ তিতিক্ষাময় ব্রাহ্মণের জীবন যাত্রা, শিক্ষায়-দীক্ষায়-জ্ঞানে তাঁরা গরিয়ান। দারিদ্রকে অম্লান বদনে স্বীকার করে তাঁরা যুগে যুগে জ্বালিয়ে রেখেছেন জ্ঞানের দীপশিখা। এ হেন ব্রাহ্মণ কার না নমস্য? ব্রাহ্মণের এ মহিমা ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত ছিল। এখন যদি ব্রাহ্মণ সে ত্যাগ-তিতিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়, আমরা যদি সে গৌরবময় আদর্শকে অবনতি করি তাহলে তার দায় কি জাতি ভেদের? এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ জন্মদিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ। আজ তো দেশে জাতিভেদের কড়াকড়ি হ্রাস পেয়েছে। তবুও কেন এই উৎশৃঙ্খলতা, রেষারেষি, হানাহানি, দেশব্যাপী এ হতাসা? আসলে দেশ হয়ে পড়েছে বীর্যহীন। তাই মৌলিক চিন্তাধারা হারিয়ে পরের মুখে ঝাল খেয়ে, সমাজকে গালাগাল দিয়েই দায়মুক্ত। দেশের ইতিহাস কেউ পড়বে না, জানবে না, শুধুই পরের কথায় নাচানাচি।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ধর্মমহাসভার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনারা কে কে হিন্দু শাস্ত্র পড়েছেন হাত তুলুন।" উত্তরে মাত্র দু'তিন খানা হাত উঠলে বিবেকানন্দ একেবারে টো (Toe) এর উপর দাঁড়িয়ে গর্জে উঠেছিলেন, "and yet dare to criticise us?" আমরা আজ সে বীর্য হারিয়ে ফেলেছি। তাই সাহেবদের কথাই শিরোধার্য। ইউরোপীয়রা আমাদের সমাজকে বোঝে না, বুঝতে পারেও না। 'ডুবে' তার এক গবেষণা গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রামকে নানা দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেছেন যে এই গ্রামটি ভারতের যে কোন সুদূরতম প্রদেশে বসিয়ে দেওয়া যায়; তাতে পারিপার্শ্বিক এতটুকু বেমানান মনে হবে না। এই যে ঐক্য তাকি কোন বিদেশীর চোখে পড়বে? প্রথম কথা দেশকে ভালোবাসতে শেখ-ভালমন্দ নির্বিশেষে। তারপর ভালভাবে বিচার কর। যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না তা নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান কর। জাতিভেদ কোথায় নাই? প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস দেখ। সেখানে সমাজ ওদের নানা গিল্ডে বিভক্ত ছিল। আজও ইউরোপীয় সমাজ-আভিজাত্যের মাপকাঠিতে নানাভাগে বিভক্ত। আমাদের সমাজে-কড়াকড়ি মেয়ে দেওয়া আর খাওয়া নিয়ে। এখন এর ব্যতিক্রম তো হামেশাই হচ্ছে, আগেও হত। কোন ব্রাহ্মণ যদি অব্রাহ্মণ কোন মেয়েকে ঘরে আনত তাহলে পাঁচবছর দেখে শুনে আবার তাকে কুলে তুলে নেওয়া হত। তাছাড়া কোন মেয়েই সাধারণতঃ চায় না তার চেয়ে হীন কাউকে বরণ করতে? আন্তর্জাতিক মত বিয়ে হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইওরোপীয় মেনেই বেশি ভাবতে আসছে; কটা ভারতীয় ইউরোপীয়ানকে বিয়ে করেছে? ভারতীয় মেয়েদের মনে কেটা আর্য গরিমা বোধ রয়েছে।

আমি রয়েছি একটা অদ্ভুত পরিবেশে। একদিকে মুসলমান, অপরদিকে বর্ণহিন্দু। আশেপাশে রয়েছে উচ্চবর্ণেরাও। সন্ধ্যায় একদিকে আজানের ধ্বনি শুনি, অপরদিকে শঙ্খ-ঘণ্টার আওয়াজ। ওরা নিজেদেরকে বিভিন্ন জাতি মনে করে; কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধ নাই। কেউ বলে ভগবান, কেউ বলে আল্লা; তাতে সদ্ভাব না থাকার কি আছে? আমি তো খাবারটাই খাই; মুসলমান দিলেও খাই, বাগদী দিলেও খাই। এমন কি আমার এখানে যে কাজ করে শ্রীনিবাস, সেও খায়। বলে খাওয়ার মধ্যে আবার জাত কি?

সম্প্রতি একটা চিঠি পেলাম। এক ব্রাহ্মণ লিখেছেন যে তিনি অষ্টমীর দিন চণ্ডীপাঠ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়ে যান। পাঠের সময় নাকি এক কায়স্তের স্পর্শ লেগে যায়। আমি তো ভাবছি লিখব, 'খুব তো অরবিন্দ জপ করেন। তা অরবিন্দ কোন বামুনের ছেলে ছিল?' এসব হল জাতি ভেদের অজ্ঞানতা। যেখানে এ অজ্ঞানতা মূঢ়তা সেখানে আমি নিজেই খঙ্গা হস্ত। কথাবার্তা চলছে। বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছে অঝেরে। এমনি সময়ে এক বয়স্ক ভদ্রলোক গাছের কিছু জাম নিয়ে এলেন। পরে জানলম তিনি স্বামীজির এখানের সহপাঠী।

একটানা অনেকক্ষণ বলে স্বামীজি থামলেন। আগন্তুক ভদ্রলোক অল্প কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ নীরব থেকে অন্য প্রসঙ্গে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামীজি, রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্যে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় পড়েছি—

" ***   *** সেই সত্য যা রচিবে তুমি,

ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।”

স্বামীজি বললেন, “হ্যাঁ ভগবান কবি। এই সৃষ্টি তাঁর কাব্য। কবি ক্রান্ত দর্শী; শুধু বর্তমানকেই তিনি দেখেন না, তাকে ছাপিয়ে আরও কিছু। গত চিঠিতেও স্বামীজির লিখেছেন, “*** *** ভগবানকে ভাবেই পাওয়া যায়, আর সাধারণ মানুষেরা কাব্যের ভিতর দিয়ে রসরূপে-তাঁর আভাষ পায়। *** *** একদিন মানসীকে নিয়ে অনেক কবিকল্পনায় মেতে ছিলে। তার আগাগোড়াই কিভুল? বাইরের মানসীর সঙ্গে তাঁকে মেলাতে পারলে না—কিন্তু মানসীর কল্পরূপ তো অনুভবে সত্য। অনুভব যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর হয় তেমনি অতীন্দ্রিয় বস্তুরও হতে পারে। উজ্জ্বল আত্মানুভূতিই ভগবান—যার বৈদান্তিক বিবৃতি হল, ‘অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম’—এই আত্মাই ব্রহ্ম এমনিতর একটা অপরোক্ষ অনুভব।

ভগবান দেখার শুরু হয় ওই আত্মানুভব থেকে। নইলে ভগবান তোমার মত বা মানসীর মত কোনও মানব বা মানবী মেঘের ওপারে বসে আছেন তা তো নয়।

ভগবান সৎ চিৎ আনন্দ। তুমিও সৎচিৎ আনন্দ এখন না হলেও হতে পার—চেষ্টা করলে। তা করবে না, কেবল তর্ক করবে। এটাকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলে না। তোমার সত্য চেতনার আনন্দ যত বাড়বে ততই ভগবানের অনুভব তোমার পক্ষে জোরালো হবে, সহ হবে। শেষে অনুভব করবে, তিনিই সব হয়েছেন। কথাটা এদিক থেকে বিচার করো।”

শ্রীরামকৃষ্ণও এ কথাই বলেছেন যখন নরেনকে বলেছেন, “হ্যাঁরে দেখেছি, তোর চেয়েও স্পষ্ট করে।’ প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজি আরও বললেন, “বহির্জগতের তো অন্তর্জগতও রয়েছে; সে জগৎ ও তেমনি সত্য। আমরা যখন বাইরের জগতটাকে একমাত্র দেখি, তখন ভিতরের জগতটা চোখে পড়ে না। চেতনার আলোকে আবার যখন অন্তর্জগৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন বাইরের জগতটা ফিকে হয়ে যায়। তখন সেই অনুভবের জগৎ আরও সত্য সুন্দর। এই অন্তর্জগতের আলোতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “হ্যাঁরে দেখেছি।’ ভগবানকে পাওয়া যায় অনুভবে। আমরা প্রথমেই ভগবানকে দেখতে চাই।” সাধনায় তাঁকে প্রথমে অনুভব করতে হয়। তারপর দেখা দেন।

বাইরে রিকসা হর্ন বাজালে স্বামীজি বললেন, ‘যাবে? নাকি আরেকটু বসবে? বসলে রিকসা বলে এস।’ তখনো বৃষ্টির বিরাম নেই। স্বামীজি বারান্দায় এসে আলো জ্বালিয়ে ছিলেন। এমনি সময়ে এক সুপুরুষ যুবক ঘরে ঢুকলেন। পরে আলাপ পরিচয় জেনেছি উনি ‘শৃন্বন্তু’ সম্পাদক শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য। ভদ্রলোক জ্ঞানী, গুণী ও স্বামীজির বিশেষ প্রিয়পাত্র। সাধনা ও অনুভূতি নিয়ে স্বামীজির সাথে যে আলাপ আলোচনা করেছেন তাতেই বুঝেছি। ওখানে বসেই ‘শৃন্বন্তু’ র বার্ষিক গ্রাহক হয়ে নিলাম সাত টাকা চাঁদা দিয়ে। আমি দশটাকা দিলে তিন টাকা ফেরৎ দেন স্বামীজি তাঁর নিজের ড্রয়ার খুলে। কারণ অমলেশ বাবুর কাছে তখন ফেরৎ দেবার মত টাকা ছিল না। আজ দুঃখ হয় টাকাটা কেন সেদিন স্বামীজির কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নিলাম। অমলেশ বাবু স্বামীজির জন্য শৃন্বন্তুর শারদীয়া সংখ্যা নিয়ে এসেছেন। তাতে স্বামীজির দু'টা কবিতা রয়েছে? স্বামীজি কবিতাদুটি সম্পর্কে অমলেশ বাবুর সাথে আলোচনা করলেন। প্রসঙ্গত বললেন, “আমি কবি, দার্শনিক নই। কবিতা লিখেছি অনেক, এখনো লিখি; তবে কবিতা লিখতে গিয়ে আবার তোমাদের যোগান দেওয়া অর্থ চিঠিপত্র ও অন্যসব লেখা হয়ে ওঠে না। কেন খানিকক্ষণ চুপচাপ। টেবিল ল্যাম্পের ম্লান আলোয় স্বামীজির অস্পষ্ট মুখছবি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। নীরবতা ভাঙ্গলেন অমলেশ বাবু—সাধনা সম্পর্কে কিছু আলোচনায়। আবার চুপচাপ। একবন্ধুর জন্য স্বামীজির একখানি ছবি চাইলাম। বললেন পরে পাঠিয়ে দিবেন। কতক্ষণ থেকেছি জানি না। তবে ঘণ্টা দুই তো বটেই; কম নয়। রিকসা আবারও হর্ন বাজালে সবাই ওঠলাম। এবারে স্বামীজি কাজে বসবেন। বৃষ্টি থামেনি। প্রণাম করে সবাই বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই স্বামীজি একটু দাঁড়াও বলে ঘরে ঢুকে হাতে করে নিয়ে এলেন দেবীর নির্মাল্য—তিনটি লাল গোলাপ। হাত বাড়িয়ে নিলাম, বললেন ‘এর নাম সুচিত্রা’, মাথায় ঠেকিয়ে পকেট পুরে’ বিদায় নিলাম। সার্থক আমার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার।

শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য আজকের এই প্রথম পরিচয়ের সৌহার্দ্য আজীবন মনে রেখেছেন। পরবর্তী কালে দেখা হলে মনে করিয়েছেন ওনার হয়ে স্বামীজির তিনটাকা ফেরৎ দেবার গল্প। কলকাতায় গেলে 63, কলেজ স্ট্রীট শৃন্বন্তু অফিসে ওনার সাথে অবশ্যই একবার দেখা করতাম। তেলেভাজা,মুড়ি-চায়ের আড্ডায় সামিল হয়েছি, যদিও আমার দিক থেকে কিছুটা সংকোচ ছিল। কিন্তু ওনার আন্তরীক আহ্বান উপেক্ষা করতে পারি না। পণ্ডিত লেখক। আর মহাভারতের কথা, রামায়ণ কথা বাংলার বিদ্ধজনদের উচ্চ প্রশংসিত। বই দুটি আমার সংগ্রহেও আছে। রামায়ণ-মহাভারতের উপর এত ভাল বই আর পড়িনি। তাছাড়া আছে অরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম।

ওনার কাব্যগ্রন্থ "নিঃসঙ্গ আকাশ "আমায় নিজ হাতে উপহার দিয়েছেন"। কোনও এক অপরাহ্নে সেক্সপীয়র ঘরণীর অরবিন্দ ভবনে হঠাৎ দেখা। ছেলে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন। এসেছেন ভাগবত পাঠ করবেন। ভক্ত শ্রোতারা প্রতীক্ষায়। আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন অনির্বাণের একনিষ্ঠ ভক্ত-অনুরাগী বলে এবং পাশে বসালেন। আমি অপ্রস্তুত। তথাপিও ওনার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে পাশে বসে দীর্ঘক্ষণ ওনার সুললিত ভাগবত কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম। কথা শেষে বিদায় নেওয়ার আগে অনুরোধ করলাম, 'রামায়ণ-মহাভারতের কথা লিখেছেন; এবারে ভাগবত কথা লিখুন।' শুন একটু হো হো বললেন, 'বড় কঠিন; সাহস হয় না। তবুও ইচ্ছা আছে।' ওনার সে সদিচ্ছা ঠাকুর পূর্ণ করেননি।

স্বামীজি চলে যাবার পর বিষণ্ণ মনে ওনাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তার জবাবে সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন,

প্রীতিভাজনেষু—

অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হল। অনির্বাণজী নেই একথা ঠিক নয়— তিনি আছেন যেমন ছিলেন আমাদের ভালবাসায়, শ্রদ্ধায় বন্ধুত্বে; তবে দৌড়ে কাছে গিয়ে বসবার মত আমাদের এখন আর কেউ রইল না। যাঁর কাছে একটু বসলে মনে হয় যেন আশ্রয় পেলাম। তাই কষ্টে হচ্ছে আমাদেরও।

'শৃণ্বন্তু'র একটি বিশেষ সংখ্যা বার করবার চেষ্টায় আছি, দেখি কতদূর করা যায়।

আপনার মনে আছে দেখছি, কিন্তু "সাবিত্রী প্রসঙ্গ" শুরু করবার সময়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। উনি Tape থেকে তোলা হলে edit করে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু....

আমার প্রীতি গ্রহণ করবেন।

অমলেশ ভট্টাচার্য?

(কিছুদিনের মধ্যেই শৃণ্বন্তুর একটি অনির্বাণ স্মৃতি সংখ্যা বের করেছিলেন। অনুরাগী—ভক্ত বিদ্দজনদের অনেকের লেখাই ছিল। কয়েকটি লেখা 'অনির্বাণ-স্মৃতি' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছ।) *** ***

—ঃঃ—

ব্রহ্মনির্বাণ ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

(শ্রী দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র-প্রবন্ধ)

প্রিয়বরেষু—বাইরে থেকে ঘুরে এসে আপনার চিঠিখানা পেলাম। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্মের সমন্বয়ের একটি সুন্দর সূত্র ঠাকুর নিজেই দিয়েছেন গীতার শেষের দিকে ঃ

যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

আমি এ-কথার তুলনা পাই না। আমার প্রবৃত্তি তো তাঁরই প্রেরণায়। আর তিনি তো ছেয়ে আছেন সব কিছু—দেশে কালে ঘটনায় অঘটনে বাইরে ভিতরে— কোথায় তিনি নাই? কাজ তিনিই দিয়েছেন, শক্তির জোগানও দিয়ে চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে। থামতে দিচ্ছেন না—না আপনাকে, না আমাকে। ব'সে ব'সে নাক টিপ্‌ব, গাঁজায় বুঁদ হয়ে শূন্য ব্রহ্ম অনুভব করব বা অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারে অহরহ ডগমগ থাকব বা ফুল তুলে মালা গেঁথে চন্দন ঘ'ষে তাঁকে সাজিয়ে অর্চনা করব—কিছুই তো করতে দিলেন না। তবুও সাধ যায়, অর্চনা করি। কোথায় ফুল পাব? বলি, আমার কর্মই তোমার পায়ে ফুলের অর্ঘ্য। এই যে চিঠি লিখছি, ঠাকুর! তোমাকেই লিখছি, নিজেকে গলিয়ে দিয়ে তোমার চরণ ধুইয়ে দিচ্ছি। এ-যাত্রায় যদি এই করাবে আমায় দিয়ে তাই তোমার সাধ, আমি তাতে বাদ সাধ্‌ব কেন? তোমার কাজ করব—এইই আমার পূজা জানব, তুমিই সব জুড়ে রয়েছ অন্তর বাইরে—এইই আমার জ্ঞান।

এমনি ক'রেই যদি দিন কেটে যায়, যাক না। বলব ধন্য তুমি। সুধা দিয়ে মাতাও যদি, বলব ধন্য হরি! দেখা না দিয়ে কাঁদাও যদি, বলব ধন্য হরি!

আপনি ঠিকই বলেছেন, আবার যদি জন্মাতে হয় তাতেই বা দুঃখ কি? এ-জন্মটা তো নিতান্ত বিস্বাদ ঠেকে নি। দুনিয়াটা একাবারে যাচ্ছে তাই এইই বা বলি কি ক'রে? জন্মান্তরকে ভয় করা, জগৎকে মিথ্যা বলা—এগুলিই কুসংস্কার, এগুলিই অজ্ঞান। জন্মান্তরের বা জগতের কর্তা আমি নই। আমি তাদের সমালোচনা করতে যাই কোন সাহসে?

আসল কথাটি কি জানেন? অনেক কিছু কৃচ্ছ্র-সাধনার আড়ম্বর ক'রে কিছুই হয় না। সরল বুদ্ধিতে শেষের কথাটি বুঝে নিলেই

হয়—"আমি তোমার।" যেখানে রাখো, যে-ভাবে রাখো, আমায় নিয়ে যা খুশি করো—আমি তোমার। "তুমি আমার"—এ-কথা বলার জোর আমার কোথায়? আর "তুমিই আমি"—এইই বা বলি কি ক'রে? শুধু জানি আমি তোমার, আমি তোমার। যেমন ক'রে আমায় গড়েছ, আমি তেমনি ক'রেই গড়া তোমার খেলার পুতুল। আমি তোমার খেলার পুতুল। আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার। নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুধু কর্ম ক'রে কি তাঁকে পাওয়া যায়? জোরের সঙ্গেই বলব নিশ্চয় পাওয়া যায়। আমার গুরুগৃহের কথা মনে পড়ে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টা বিশ্রাম আর একুশ ঘণ্টা খাটুনি। আর খাটুনি চাষার মতো, মজুরের মতো। মনের মধ্যে অহরহ একটা ভাব—এ তোমার কাজ, যেন সুন্দর ক'রে করতে পারি। মাটি কোপাতে হচ্ছে—যেন সুন্দর ক'রে কোপাতে পারি। ধান ভানতে হচ্ছে—যেমন সুন্দর ক'রে ভানতে পারি। ছাত্রদের বেদান্তের পাঠ দিতে হচ্ছে — যেন সুন্দর ক'রে দিতে পারি। স্ত্রী যেমন ক'রে স্বামীর সেবা করে, তেমনি ক'রে সেবা করা। আর তাইতে বুক ভ'রে উঠত, চোখে আলো ফুটত, শিরায় শিরায় শক্তি আর আনন্দের স্রোত বইত। তাঁর রহস্য চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাস্তবিক, গোপী না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভালোবাসতে হবে ঠিক মেয়েছেলের মতো, ঠিক মীরার মতো। পুরুষভাব একেবারে বিসর্জন দিতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি নিজেকে "পু" বলতে পারি না। একথার তুলনা নাই।

আর পুরুষভাব যদি নিতান্তই বিসর্জন দিতে না পারি, তা হ'লে থাকব তোমার গোঠে তোমার সঙ্গে তোমার ধেন্যু চরাব। এইই তো আমার কাজ। কর্ম তো নয়, গোষ্ঠলীলা। দিনের বেলায় গোষ্ঠ আর রাত্রে কুঞ্জসেবা। তখন আর সখা নই, সখী—আমি তোমার সুবল, তোমার নর্মসখা—তোমার লীলার গোপন কথাটি যার কাছে তুমি উদ্‌ঘাটিত করেছ, যে একাধারে তোমার সখা আর সখী দুইই।

কিছু চাইবেন না তাঁর কাছে—মুক্তি নয়, জ্ঞান নয়, পুনর্জন্মনিরোধ নয়, সাধনার কৃচ্ছ্রতা বা ঐশ্বর্য বা বিভূতি কিছুই নয়। শুধু "আমরা তোমায় ভালোবাসি।"

আশা করি 'স্বে স্বে কর্মণ্যাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'—গীতা, ১৮/৪৫—নিজের নিজের কর্মে ব্রতী থেকেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।

আপনার দ্বিতীয় পত্রখানা পেলাম। গীতার ঐ সমস্যার জবাব আপনি নিজেই দিয়েছেন। জ্ঞানের ভিতর দিয়েই হোক বা প্রেমের ভিতর দিয়েই হোক, যতক্ষণ আমরা তাঁকে না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বস্তুতই দুঃখী। অথচ এমনি মোহের ফের যে, আমরা যে দুঃখে আছি, সে-কথাটা বুঝতেই পারি না। ভাবি—"বেশ আছি।" এরই নাম অবিদ্যা—বেশ যে নেই যা নিয়ে মেতে আছি তাই পরমার্থ নয়, তারও পরে আর কিছু আছে—তা বুঝতে না পারা। শাস্ত্রে এটাকে বলেছে বিপর্যয় বুদ্ধি বা wrong valuation of life। আমাদের দেশে দুঃখবাদী দর্শনগুলি অবশ্য এটার উপর খুবই জোর দিয়েছে। যদিও গীতা ততটা জোর দেয়নি, তবু গোড়ার কথাটা সেও মেনে নিয়েছে। দুঃখবাদী দর্শনগুলি অবিদ্যার একটা সাংস্কৃতিক দাওয়াই বাৎলালো—দেহ ধরলেই যখন দুঃখ পেতে হয়, তখন আর যাতে দেহ না ধরতে হয়, তার একটা উপায় করো। বাসনা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা—এই হল দেহ ধারণের মূলে। চিত্তে যদি বাসনা না থাকে, তা হলেই এই যে ভোগায়তন দেহ, এটা ধরবারও কোনও প্রয়োজন থাকবে না।

এই থেকে বেরিয়ে এল জ্ঞান আর বৈরাগ্যের পথ। চিত্তকে বাসনাশূন্য করবার কথা অবশ্য ভক্তও বলেন— বিষয়সুখে আর ভাগবতসুখে তাঁরাও তফাৎ করেন। কাজেই গোড়ার দিকে দুজনের পথ খানিক দূর পর্যন্ত একই—সংসারের মোহ কাটাতে হবে, বিষয়তৃষ্ণা বর্জন ক'রে তাঁর তৃষ্ণা অর্জন করতে হবে।

তা না হয় করলাম। কিন্তু ক'রে পাব কি? এইখানে এসে দুটি দর্শনের দু'রকম রায়। দুঃখবাদী দর্শন বলবে, বাসনা বর্জন করলে আর সংসারে তোমায় আসতে হবে না,তুমি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। ভক্তের দর্শন বলবে, শূন্যে মিলবে কেন, পাবে তাঁকে —যিনি এই সব কিছু হয়েছেন।

উপনিষদে এই দুই পথের কথাই আছে। একটি হচ্ছে যাজ্ঞবল্ক্যর নেতিবাদ—যদিও তিনি একেবারে সব উড়িয়ে দেননি—আর একটি হচ্ছে শাণ্ডিল্যের ইতিবাদ —তিনি বললেন, সবই ব্রহ্ম জেনে শান্ত হয়ে উপাসনা করো।

গীতা এই দুটি বাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করে নিয়েছেন গোড়াতেই। প্রথমেই বলেছেন, তাঁকে পেতে হবে, তাঁতে স্থির হতে হবে, তার জন্যে যদি বলতে হয় সংসার দুঃখময়—সেটা মিথ্যা বলা হবে না। কিন্তু তাঁকে পেয়ে হাওয়া হয়ে গেলে চলবে না—ফিরে আবার এখানে আসতে হবে, তাঁর কাজ করতে হবে। এই হল ব্রাহ্মীস্থিতি। তার পর ব্রহ্মনির্মাণ? সে তো আছেই। যে দিন এখানকার কাজ ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ব্রহ্মনির্বাণ তো আসবেই, এমন কি এখনও ব্রহ্মনির্বাণের অনুভব তোমার হবে—যদি তুমি নিজেকে জানো। আর নিজেকে না জানলে তাঁকেও জানা যায় না। তাই তো গীতার প্রথম দিকটায় ভগবান আত্মজ্ঞানের উপর এত জোর দিয়েছেন।

যখন নিজেকে জানলাম, তাঁকে পেলাম, তখন তাঁর কর্ম করে জীবনপাত করব। তখন আর আমি তা কর্তা নই, অকর্তাও নই—আমি তাঁর নিমিত্ত। তিনি নিজেই বলছেন, "আমি বারবার এ-পৃথিবীত এসেছি, তুমিও এসেছ অর্জুন, কিন্তু তুমি তা জানো না, আমি জানি।" আমি যদি ঠাকুরকে পেয়ে ঠাকুরের সাধর্ম্য লাভ করতে পারি, (এটা গীতারই কথা) তাহলে তিনি যখন বারবার আসবেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর তল্পি ব'য়ে আমিও আসব না কেন? এই একটা আশ্বাস কিন্তু গীতার আছে তাতে পুনর্জন্মের সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায়।

—ঃঃ—

অভিমান খুব খারাপ জিনিস, মা

মনোজ বাগ

অভিমানই অন্তররায়। অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান অন্তরায় এই অভিমান-ই। শুধু কী অধ্যাত্ম সাধন। জীবন জুড়ে যত রকমের সাধনা আছে, সমস্ত রকম সাধনার অন্তরায় অভিমান।

আমার ভাবনাই আমার কাছে শেষ কথা, চিন্তা-ভাবনার এই সংকীর্ণতাই, অভিমান। অধ্যাত্ম সাধনার বা ঈশ্বর সাধনার শুরু এই অভিমানটিকেই নস্যাৎ করার চেষ্টা দিয়ে। এখানে আমরা "চেষ্টা" শব্দটি ব্যবহার করেছি। কারণ এটি প্রতিটি মুহূর্তের সাধনার ব্যাপার। এক মুহূর্তেরও বিরামের সুযোগ এখানে নেই। হাজার বছরের সাধনার ইতিও মুহূর্তের অসাবধানতায় ঘটে যাওয়া এখানে অস্বাভাবিক নয়।

ধড়ে প্রাণ থাকলেই যে কোন বস্তুই প্রাণী অর্থাৎ একটি জীবন্ত সত্তা এবং যে কোন জীবন্ত সত্তার কাছেই সদাসর্বদা দুটি সত্য বর্তমান। একটি তার ব্যক্তি সত্য আর অন্যটি জগৎ সত্য। এই জগৎ মহাজগৎ। ব্যক্তি সত্য তার ব্যক্তি সত্তা। ব্যক্তি সত্তার আছে স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা। এটিই তার প্রাণের জানান, নিজস্বতার ঘোষণা। ভাবটা যেন দেখো আমিও আছি। এটি তার ভিতরের উদ্ভাবনা ও বাহিরের উদ্যমের ইঙ্গিত। সে যে জগতে আছে তার প্রমাণ। আমি কীট-পতঙ্গ হই বা মানুষ, আমার কাছে আমি মানেই সেটি একটি অজস্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা সমন্বিত চেতন সত্তা। যে চেতন সত্তাটির নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্ষুধা, তৃষ্ণা পায়, আশপাশটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছা হয়। এটিই জীবনের বৃত্তি বা প্রবণতা। এই প্রবনতাগুলি নিয়েই জীবন। প্রতিটি জীবনই এই প্রবনতাগুলি নিয়ে জগতে টিকে থাকে। সাধারণ জীবন এই প্রবনতাগুলি নিয়েই নিজেকে জানে, বোঝে; এই প্রবনতাগুলির ভিতরে থেকেই জগৎ দেখে। জগৎকে জানে বোঝে। তার এই জানা, বোঝা, দেখাগুলিরও ঈশ্বর দেখাই। তার এই নিত্যদিনের প্রতিটি মুহূর্তের জানা বোঝাগুলি ঈশ্বরকেই জানা বোঝা। সাধারণ জীব এই সত্যটি জানে না। তার এই প্রতি মুহূর্তের জানা-বোঝাগুলি, ঈশ্বর সত্যটি না জেনেই বা না বুঝেই বোঝার মতো। এটি একটি সদ্যজাত শিশুর অবোধ মনে আশপাশের পরিবেশ -পরিস্থিতি ও পরিজনকে জানার মতো। যেন সে একটা কিছু দেখছে বটে কিন্তু সে যে কী দেখছে তার কাছে তার দেখা বস্তু বা প্রাণীগুলির গুরুত্বই বা কী, সে তার কিছুই সেভাবে জানে না। তবুও ঐ সামান্য দেখা, সামান্য বোঝা পরিবেশটাই তার জগৎ। এই ছোট্ট জগতটাই শিশুর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে বড় হতে থাকে, তার কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। শিশুর অবোধ চোখের ওই আবছা দেখাই তখন খুঁজে ফেরে প্রকৃত বিজ্ঞান, সেই সমস্ত কিছুর অনুপুঙ্খতা (Details) ।

জীবের অধ্যাত্ম সাধনার বা অধ্যাত্ম জীবনের শুরু, তার ব্যক্তি সত্তাটির সামনে যে অপর সত্তাটি বিরাট আকারে আদিগন্ত জোড়া হয়ে পড়ে আছে, সেটি যে এক পরম সত্তা বা ঈশ্বর সত্তা, এই উপলব্ধি দিয়ে। আমাদের পারিপার্শ্ব জুড়ে যে জগৎ, যে জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রতিনিত্যের ঘটা, এই জগৎই এক পরম সত্যের প্রকাশ; এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎ আসলে সেই পরমই—মানষের অধ্যাত্ম জীবনের শুরুয়াৎ এই সত্যের বোধ দিয়ে। যে মানুষের মধ্যে এই বোধ অন্য কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেইমানুষ লাখো ধার্মিকতায় নিমজ্জিত থাকলেও বা So called ধর্মকেন্দ্রিক সহস্র আচার আচরণের একনিষ্ঠ পালক হলেও, সেই মানুষের অধ্যাত্ম জীবন এখনো শুরুই হয়নি।

সাধারণ অবস্থায় বা সাধারণ জীবন ধারায় আমরা যা কিছু দেখি, সেই দেখায় আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তির বস্তুগত গঠন বা প্রকৃতিগত ধরণকেই দেখি। এটি বাহির থেকে দেখা পাতা ভাবে। তখন জীবকে দেখি জীব ভাবে, জড়কে দেখি জড় ভাবে। এরপর আসে গুণাগুণের বিচার—কোনটি আমার জন্য উপাদেয়, কোনটি অনিষ্টকর তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের পরোখ। জীবের এই রোজের জানা বোঝা-দেখা শোনাগুলোই এক মুহূর্তে বদলে যায় ঋষি জীবনে এসে। ঋষিও আর পাঁচটা ব্যক্তির মত, তিনিও দেখেন, তাঁরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। তবে তাঁর দেখাটি আর অন্য ব্যক্তিদের মতো নয়। ঋষি দেখেন যে বিরাট জগৎটি তাঁর সামনে রাখা আছে, এটি এর চেয়ে আরো অনেক বড়ো একটি জগতের কিছু অংশ মাত্র। এই ভাবনা থেকেই ঋষি উপলব্ধি করেন, তার প্রতিটি মুহূর্তের

চোখে দেখা, কানে শোনা, মনে বোঝা জগতটিরই সব গতি প্রকৃতি আসলে ঐ আরো বিরাট জগতটিরই গতি প্রকৃতিরই অংশ। তিনি নিজেও ঐ জগতেরই একটি সামান্য অংশ। কৃষ্ণোযজুর্বেদীয় উপনিষদ তৈত্তিরীয়র তৃতীয় ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের প্রথম অনুবাকে আছে এই পরমের কথা। পুত্র ভৃগুর প্রশ্নের উত্তরে এখানে মহর্ষি বরুণ বলছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদব্রহ্মেতি"। অর্থাৎ যা থেকে সব কিছু জাত, যাঁর মধ্যেই জীবিত থাকেই বা জড় থেকেই সবকিছুর অস্তিত্ব বর্তমান থাকে, বিনাশ কালে যাঁর মধ্যেই ওই সমস্ত কিছুর লয় হয়, তাঁকে জানো, তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে জানতে আমাদের উপায়—শরীর, প্রাণ, চোখ, কান, মন, বাক এই সব ইন্দ্রিয়াদিই। অর্থাৎ "অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোতং মনঃ বাচম্ ইতি"।

আমাদের জগৎ দেখাটি অকূল এক সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে ঐ সমুদ্রের ঢেউ দেখা। যতটুকু দেখছি সমুদ্রকেই দেখছি। তবে এই দেখাটিই সমগ্র সমুদ্র দেখা নয়। সাধারণ দেখায় আমরা ঐ সামান্য দেখাতেই ভরপুর হয়ে যাই। কিন্তু যিনি সমগ্র সমুদ্রের সত্য আন্দাজ করে ফেলেছেন তাঁর দেখার সাধ সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে ছ'মিনিটে ছ'টি ঢেউ দেখে গুনেই মিটে যাওয়া কী করে সম্ভব। তাই চরৈবেতি, চরৈবেতির মহামন্ত্রের নিত্য উৎযাপনা। অর্থাৎ আরো গভীরে, আরো ব্যাপ্তিতে এগিয়ে এগিয়ে চলার তাড়না। এই এগিয়ে যাওয়া, সব নিজে আত্মসাৎ করে নেবার আগ্রাসনে নয়। এই চলা, ঈশ্বরের ব্যাপ্তি-গভীরতা উপলব্ধি করারই সাধনা। যে গভীরে আছে আমার দেখা আপাত জগতেরই পরম অন্তর, যে ব্যাপ্তিতে আছে এই আপাত জগতের বিস্তার। আসলে যা পরমেরই গভীরতা ও পরিব্যাপ্তি। জীবনের উদ্ভব এই পরমেরই অবাধ চৈতন্যেরই এক বিন্দু স্ফুরণ দিয়ে। জীব-চেতনা এই পরম চৈতন্যেরই প্রাণের স্ফুরণ। বস্তুতে প্রাণ জেগে উঠলে, বস্তুর অন্তর্গত এই চৈতন্যই সজাগ হয়। মহাজগৎ নিজে এই বস্তু ও প্রাণেই একাকার হয়ে আছেন। যদিও জীববিজ্ঞানে প্রাণের উদ্ভবের বহু কারণের উল্লেখ আছে।

বাহ্যত আমরা জগতের যা দেখি তার সবটাই দৃশ্যত এই যুগল অবস্থাই। এই যুগল বস্তুই জীবাবস্থা বা জড়াবস্থা। বস্তুতে প্রাণের স্বকীয়তা প্রকট হলে, আমরা বাহ্যত দেখি স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বতঃস্ফুর্ততা। সাধারণত বস্তুতে এই স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বতঃস্ফুর্ততাটিই নেই। জীবনের শুরুতে এই স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বতঃস্ফুর্ততাটিই থাকে অস্পষ্ট অবস্থায়। জীবনের অগ্রগতি এই অস্পষ্টতাকেই ক্রমশ স্পষ্ট করে। স্বক্রিয়তায়, সময় এটিকেই গভীর ও ব্যাপ্ত করে। এই স্বক্রিয়তাই বা চলাই ব্রহ্মের চৈতন্যাবস্থার বিশেষ গুণ। তবে এ চলাটি একটি বৃত্তাকার চলা। যার কেন্দ্র-ব্যাস-পরিধি সবটুকু জুড়েই বিরাজ করেন তিনিই। তিনিই কালাকাল, তিনিই কালচক্র, সবটাই তিনি। যেখানে আমি বা আমরা তাঁরই একটি একটি সত্তা, তাঁরই বিরাট সত্তারই স্থানের একটি একটি স্ফূরণ। স্ফূরণগুলির ছোট বড় মাঝারি মাপ, আমাদের এক একটি সত্তার অন্তর ও বাহিরের আকার বা গড়ন। এঁর তরতমেই কেউ তুচ্ছ ধূল-ময়লা, কেউ মহার্ঘ হীরে-মোতি, কেউ গোস্পদ তো কেউ মহাসিন্ধু, কেউ চোর- ডাকাত তো কেউ ঋষি-মহর্ষি, কেউ অবতার পুরুষ তো কেউ তাঁরই ভক্তজন। তবে সবই নবান্নে পিঠে। পিঠের ভিতরের পুরগুলিতেও ভরা আছেন তরকারিরূপী ব্রহ্ম, ডালরূপ ব্রহ্ম, ক্ষীর-ব্রহ্ম, নারকোলের ছাঁই-ব্রহ্মরই স্বয়ং। পিঠের খোলগুলিও গড়া ব্রহ্ম-গুড়িতেই। তবুও দর্শনের, স্বাদের কত তফাৎ। চোর ব্রহ্মের সঙ্গে সাধু ব্রহ্মের স্বভাব কত ভিন্নধর্মী।

সমগ্র বস্তু-ব্রহ্মেরই আছে ব্রহ্মের বস্তুগত গুণ। তাঁর এই অস্তিত্ব তাঁর বিভুরূপেই রূপময় হয়ে আছে। অনুতেও তাঁর থাকা তাঁর এই পরম অস্তিত্বের কারণেই। যেমন আমি যেমন আমার সমগ্র জীবন জুড়ে আছি, একই সঙ্গে এই আমিই আমার প্রতিটি কেশের কোষে, নখের উপাদানেও আছি। যদিও প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তাদের নিজের নিজের স্বরূপতা, স্বকীয়তা নিয়ে আছে। খনিতে মাটি আছে, কয়লাও আছে, হীরেও আছে। যা মাটি তাতে মাটির গুণ আছে, মাটির সৃষ্টি মাটির উপাদান দিয়েই হয়েছে। কয়লা মাটি নয়, আবার যুক্তি সাজিয়ে বললে, কয়লাও তো মাটিই। তবে তা সাধারণ মাটি নয়, বিশেষ গুণ সম্পন্ন মাটি। কারণ কয়লা আরো নির্দিষ্ট কিছু আছে যা সাধারণ মাটিতে নেই। আবার হীরে কয়লার পেটের ভিতরে থেকেও তা কয়লা নয় এবং হীরেরগুণ কয়লার সঙ্গে মেলেও না। তবে সবই ব্রহ্ম দিয়ে গড়া। ব্রহ্মকণা বা God particle-ই সবের উপাদান।

স্বকীয়তা, স্বরূপতা প্রকাশ পায় বস্তুর অন্তর সত্তার অভিব্যক্তিতে, এটি যে কোন কিছুর বিকাশের বৈশিষ্ট্য। বীজের ভিতরেই থাকে একটি বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, লতা, পাতা, ফুল, ফল সব। তবু একটি বীজ হাতের তালুতে রেখে, তার অন্তরে লুকানো বৃক্ষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দূরবীন দিয়ে দেখলেও তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ ঐ বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হলে প্রাণের উজ্জীবনের সূত্রেই সময়ে সবই বাইরে বেরিয়ে আসে। জগৎ সর্বত্রই এই একই নিয়মে আছে।

তার প্রতিটি স্ফূরণেই আছে ব্রহ্মেরই বস্তুসত্তা। প্রাণীতে তাঁর বস্তু সত্তার সঙ্গে তাঁর প্রাণ সত্তারও স্বকীয়তা থাকে। প্রাণ বস্তুরই জাগর অবস্থা। তাই যে বস্তুকে সে আশ্রয় করে থাকে, প্রাণ সেই বস্তুরই মুখপাত্র হয়ে সেই বস্তুরই ভাব ব্যক্ত করে। সাধারণ জীবসকল এই নিয়মেরই বাঁধা ছকে গড়া। এই সামান্য বস্তু-আশ্রিত প্রাণেই যখনই পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ জেগে ওঠে, তখন ঐ সামান্য

বস্তুগত প্রাণের ভিতরই ফুটে ওঠে পূর্ণ ব্রহ্মের পরম ভাব। আকারে প্রকারে তিনি যদি নালা নর্দমার কীটও হন, পরমাবেশের পরম দীপ্তি তখন তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়েই ফুটে আছে। এই পরমাত্ম ভাব যার মধ্যে ফুটে আছে, তিনি ব্যক্তি হয়েও তার ভিতরের ব্যক্তিগত সব মান অভিমান ঐ পরম ভাবে গলে গেছে। এই গলে যাওয়াটাই পরম অবস্থা। এই গড়ে যাওয়া মানুষটির নিজের জন্য আঁকড়ে থাকার আর কিছু নেই। ভাবগত ভাবে তার আর কোন আঁটও নেই। তিনি তখন সমুদ্রে গুলে যাওয়া নুনের পুতুল। তিনি এখন সময়ের ধারায় সময়ের ঋতে বইছেন। তখন তাঁর দেহ থেকেও দেহ নেই, মন থেকেও যেন সে মনে তাঁর কোন অধিকারই নেই। মানুষটির যেন তখন নিজের বলে দাবি করার মতো আর কিছু নেই। নিজেকে দিয়ে কোন কিছুর বিচার করাও নেই। আচার্য শঙ্করের ভাব সূত্র ধরে বললে, তিনি তখন আছেন পরম শিবাবস্থায়। শিবাবস্থায় ঐ ব্যক্তির আত্মাভিমান Zero (শূন্য) হয়ে আছে। এই Zero অবস্থাটিই ব্যক্তি জীবনের পরম অবস্থা এবং এটিই ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থা। এই স্বাভাবিক অবস্থাটিই নানান তালে গোলে বিকৃত হয়ে যায়। শাস্ত্রে এই বিকৃত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার উপায় হিসেবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাধনের উল্লেখ আছে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রে বলছেন, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভাং তন্নিরোধঃ" (সাধন পাদ ১২)—অর্থাৎ চেষ্টা, চেষ্টা, এবং শেষ পর্যন্ত চেষ্টাই একটি বিকৃত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার এক মাত্র রাস্তা।

সবটাই হয় মনের অস্থিরতার কারণে। গীতায় ধ্যান যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম বন্ধু অর্জনকে এই কথাটির বলছেন একটু অন্য ভাবে, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"। (গীতা, ধ্যানযোগ—৩৫)।

অভ্যাসই সাধনা। এ সাধনা অলস, ঘুম-কাতরের সাধনা নয়। এ সাধনা Rolling Stone-এর, বহতা পানির।

তাই ঋষি বলছেন, চলো, চলতে থাকো। চলতে চলতেই দেখো, বোঝো, জানো। যে নিরন্তর চলছে তার পরিমার্জনা অন্তরে বাহিরে প্রতিনিয়ই চলছে। "চরণ বৈ মধু বিন্দন্তি চরণ স্বাদুমুদম্বরম্। সূযস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরং শ্চরৈবেতি চরৈরেতি"।

আমিত্বই জঞ্জাল। এই আমিত্বের জঞ্জাল দূর হলেই জীবনের সিংহভাগ সমস্যার সমাধান হয়েযায়। তাই "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল"— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি। জঞ্জালাকীর্ণ ময়লা আমি-র এই ধুয়ে যাওয়া দিয়েই এ যাত্রার শুরু। এ যাত্রার অন্তহীন পরিক্রমা জানার এষণা। এর প্রতিটি পদক্ষেপ জানারই একটি একটি পাঠ এবং এই জানা সামান্য সামান্য করে হলেও ঈশ্বরকেই জানা ঈশ্বরই জগৎ। ঈশ্বরই জীবন— এই ধরিত্রী, আশমান, মায় সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর সেই পরম প্রাণ, যা ধারণ করে আছেন আবিশ্বের সব বস্তু। এ জগতের সমস্ত কিছুরই পরম অবস্থান, পরম মূল্য তাঁর মূল্যে।

জীবন যেমনই হোক, জীবন ঐ পরম প্রাণ চালিত একটি যন্ত্রই। যে যন্ত্রের প্রধান কাজগুলির একটি ডেটা সংগ্রহ করা। অর্থাৎ জগত সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা। ডেটাগুলি তাকে দেয় জগতের কোনটি কী বস্তু তার ধারণা। উপলব্ধি, বস্তুগত এইসব ধারণারই যথাযথ বোধ। যে ধারণাগুলিকে ধারণ করে রাখে স্মৃতি। এই ধারণাগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে মন। মনের ক্রিয়া, মনন। মননকে প্রভাবিত করে এই স্মৃতিই। স্মৃতি জীবমাত্রই সবারই আছে। স্মৃতি মানুষের যেমন আছে, তেমনি অতি সূক্ষ্ম কীটানুরও আছে। স্মৃতির সম্ভারই জগতে জীবকে তার আধিপত্য কায়েম রাখতে ও বিস্তার করতে যেমন সহায়তা করে, তেমনি স্মৃতি জগতের সত্যাসত্য বিচার ও বিবেচনা করতেও সাহায্য করে। এই স্মৃতিই আমাদের সমস্ত মান-অভিমানের মূল বা উৎস।

স্মৃতি মনদর্পনে ভেসে থাকা জগতের সব প্রতিচ্ছবি, একটি সাদা পাতায় যেন ভাবের অক্ষরে লেখা সব চিত্রকল্প। আমাদের পরম জ্ঞান-উপলব্ধির উপায় এই প্রতিছবিগুলিই, চিত্রকল্পগুলিই। আমাদের চরম অজ্ঞান অভিমানের কারণও এই প্রতিছবিগুলিই, চিত্রকল্পগুলিই। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টের উদাহরণ দিয়ে। সেইসব বৃত্তি ক্লিষ্টকর যা পরম সত্যসম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা দেয়; পরম সত্যটি বুঝতে দেয় না। অক্লিষ্টকর বৃত্তি, পরম সত্য সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারনা দেয়। সহজ অর্থে সদা ঈশ্বর সত্য উপলব্ধির যা অন্তরায় সেই সাধনা, সেই সংস্কার, ক্লিষ্টকর। যে সাধনা ঈশ্বরোপলব্ধির অনুকূল তা অক্লিষ্টকর।

মনোবৃত্তির অজস্র প্রবনতা। মনের অবস্থাও অনেক। জীবনবৃত্তি এই মনেরই স্বতঃক্রিয়া। জীবন মনেরই অন্তর ও বাহ্য ক্রিয়া। এই ক্রিয়াতে প্রতি মুহূর্তের শক্তি জোগাচ্ছে প্রাণেরই স্ফূর্তি। এই স্ফূর্তিই আমাদের চেতনা। জীবন যন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্তি যে প্রাণের কারণে, এই প্রাণই ফুটিয়ে রাখে তার চেতনাকে। চেতনার আবিলতাই অভিমান। চিন্তা চেতনা অনাবিল হলেই, তখন সাধারণ চর্মচক্ষই যা কিছু দেখছি সবেতেই দেখছি ঈশ্বরেরই স্বরূপ। তবে এটি একটি ব্যক্তির ব্যক্তি সাধনা। ব্যক্তি মাত্রই তার চোখ ঢাকা আছে পর্দায়। যে পর্দা আলোর, যে পর্দা অন্ধকারেরও। একটি একটি মুখের সামনে থেকে ঐ পর্দা সরে না গেলে যথাসত্যের দর্শন, উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে যে চোখের ওপর থেকে পর্দা সরে গেছে, সেই সেই চোখেই ফুটে আছে দিব্যের পরম ভাব।

আজকের যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বে যেখানে জীবনের সমস্ত রকম নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই তলানিতে এসে ঠেকেছে, মানুষের সভ্যতাকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে প্রতিটি মানুষের এই অন্তর জাগরণ, অন্তর্দৃষ্টির উন্মোচন, এই আত্মস্থিতিই একমাত্র উপায়।

—ঃঃ—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st September 2024
Bhadra–1431
Vol. 22. No. 5

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.